অম্ল-মধুর

নারায়ণ চৌধুরী



ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক
নৃপেন্দ্র নাথ দত্ত
ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬২

মুদ্রাকর
প্রকাশ চন্দ্র সরকার
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
৩৯।১ শিবনারায়ণ দাস লেন।
কলিকাতা—৬

আড়াই টাকা

শ্রীমতী সুষমা চৌধুরী

কল্যানীয়াসু।

এই গ্রন্থে সংকলিত নিবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'যুগান্তর সাময়িকী'তে 'অম্ল-মধুর' পর্যায়ে শ্রীসুদর্শন চৌধুরী ছদ্মনামের আবরণে আমার কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। কয়েকটি নিবন্ধ তা থেকে বেছে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হল। বইয়ের 'অম্ল-মধুর' নামকরণের সূত্র এই খানেই নিহিত। 'যুগান্তর' এর বার্তা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয়ের আনুকূল্য ও প্রেরণা ছাড়া 'অম্ল-মধুর' পর্যায়ের সূচনা হতে পারত না; এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত অরবিন্দ পোদ্দার এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বন্ধুত্বের অমর্যাদা ঘটাতে চাই না।

২রা অক্টোবর, ১৯৫৫ গ্রন্থকার।
কলিকাতা।

ভালো ও মন্দের তত্ত্ব

ভয় নেই, কোন দার্শনিক তত্ত্বকথার অবতারণা করতে বসি নি। নিতান্তই সাধারণ ভাবে আজ ভালো মন্দের কথা আলোচনা করব।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, অমুক লোক ভালো; অমুক মন্দ। কিন্তু ভালো আর মন্দ সম্পর্কে ওরকম প্রত্যয়সিদ্ধ দ্বিধাহীন মন্তব্য কি করা সম্ভব?—মনে তো হয় না। কাকে ভালো বলব কাকে মন্দ, এই নিয়ে যেখানে প্রশ্ন, সেখানে বড জোর আমরা এই বলতে পারি, অমুক লোকের ভিতব ভালোর উপাদান মন্দের চাইতে বেশি; অমুকের ভিতর ভালোর উপাদান মন্দের চাইতে কম। কিন্তু তার দ্বারাও স্পষ্ট করে মানুষের ভালোত্ব মন্দত্ব নির্দেশ করা যায় কিনা শক্ত। কারও মধ্যে ভালোর উপাদান বেশি থাকলেই যে সে 'ভালোমানুষ' হয়ে গেল এমন কোন কথা নেই। তার চরিত্রে এমন দু' একটি মারাত্মক ক্রটী থাকতে পারে যার ফলে তার ভালোত্ব অনেকখানি খণ্ডিত আর ব্যর্থ হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয। যেমন ক্রোধী সৎ ব্যক্তি। অন্যান্য সব দিক থেকে ভালো হওযা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অন্যায রকমের ক্রোধী হতে পারেন। মাত্র একটি দোষ, কিন্তু এই একটি দোষই আলোচ্য ব্যক্তিব ক্ষেত্রে 'গুণরাশিনাশী' হয়ে দাঁড়াতে পারে। ক্রোধকবলিত মানুষের পক্ষে যে কোন রকমেব অন্যায় আচরণ সম্ভব। ক্রোধপ্রভাবাৎ মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয। আর এই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতার অবস্থায় অতি সজ্জন সুধী ব্যক্তি পর্যন্ত মুহূর্তেকে পশুর স্তরে নেমে আসতে পারেন। একবাব পশুর স্তরে নেমে এলে মানুষের

দ্বারা কী পরিমাণ ও কত দূর অনিষ্ট সাধিত হতে পারে সে কথা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। কাজেই আলোচ্য ব্যক্তির বেলায় একটিমাত্র চারিত্রিক ত্রুটিই তাঁর সকল ভালোত্বকে কাচিয়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। ভালো হয়েও তিনি ভালো নন।

অপর পক্ষে, চরিত্রে মন্দের উপাদান বেশি থাকলেই কোন লোক বিনিঃশেষে মন্দ হয়ে ওঠে কিনা তাও সমান সন্দেহকর। একজন লোক মাতাল হতে পারে, মিথ্যাবাদী হতে পারে, ঠক-জোচ্চোর হতে পারে। তাই বলে এরকম হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয় যে, সে লোক যথার্থ সৌন্দর্যপিপাসু, উপরন্তু ভালোবাসবার ক্ষমতা তার অসীম। ভালোবাসতে পারার ক্ষমতা সংসারে বড় দুর্লভ। যে লোক ভালোবাসতে জানে তার সাতখুন মাপ। সৌন্দর্যপিপাসা সম্পর্কেও এই কথা। সৌন্দর্যের তৃষ্ণা যে মানুষের মধ্যে সহজাত সে একটি মস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। এই ঐশ্বর্য তাকে নানা অভিশাপ থেকে রক্ষা করে। শিক্ষার দোষে কিংবা পরিবেশের কুপ্রভাবে একজন ব্যক্তি উত্তর জীবনে কদাচারের অধীন হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা এ কথা বোঝায় না, তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত সকল সদ্বৃত্তিরই বিনিঃশেষ অবলোপ ঘটেছে। হয়তো এমন হতে পারে, সৌন্দর্যের দ্বারা মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা অথবা ভালোবাসার জন্য আত্মদানের ক্ষমতা শেষ বয়স অবধি তার জীবনে অবিকৃত থেকে যায়। এ সম্পদ কত বড় সম্পদ তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। এখন কথা হচ্ছে, এরকম ক্ষেত্রে কোন মানুষকে কি মন্দ আখ্যা দিয়ে চিরকালের জন্য অপাংক্তেয় করে রাখা সম্ভব ?—আমি তা মনে করি না। সাধারণ নৈতিক বিচারের মানদণ্ডে তার চরিত্রে বহু দোষ থাকতে পারে, জনসাধারণের চক্ষে এমন মানুষের মর্যাদা না থাকাই সম্ভব, কিন্তু অন্তঃস্বভাবের বিচারটাই যদি স্বভাববিচারের প্রকৃত মানদণ্ড হয়, তবে এই ব্যক্তিকে

কোনক্রমেই অস্পৃশ্য গণ্য করা যায় না। বরং, অনেকের উপর দিয়ে এর স্বভাবের জিৎ। গতানুগতিক ধারণাসম্মত মামুলি খারাপ লোক তো সংসারে কতই আছে, আবার মামুলি ভালো লোকেরও অভাব নেই। কিন্তু মন্দগুণসম্পন্ন অথচ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিত্ব কটা মেলে? উপরে যে তথাকথিত মন্দ লোকের নমুনা গ্রহণ করা হয়েছে তাকে মন্দ বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তার চরিত্রে বহুতর ক্রটী যেমন আছে, তেমনি দু'একটি বিশিষ্ট সদ্‌গুণও আছে। গুণ বা দোষের সংখ্যাগত বিচার না ধরে পরিমাণগত বিচার যদি ধরা হয়, তবে বর্তমান চরিত্রে দোষের অথবা গুণের আধিক্য ঘটেছে সে কথা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কয়লার ভিতরকার হীরকখণ্ডের ন্যায় এক-একটি বিরল গুণ অনেক সময় অযুত দোষের আকরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সঞ্চিত কালোর স্তূপ থেকে এই উজ্জ্বল ধাতুকে আহরণ ও উদ্ধার করবার ক্ষমতা থাকা চাই। সকলের তা থাকে না।

বলাই বাহুল্য, উপরে যে সব কথা বলা হল তা মন্দত্বের সমর্থনে আদৌ নয়; দোষে গুণে মিশ্রিত মানুষের যে রূপ তার প্রকৃত স্বরূপ এবং যা আমাদের চোখে সহজে ধরা পড়তে চায় না, তাকে এস্থলে উদ্‌ঘাটনের খানিকটা চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

কেউ কেউ বলতে পারেন, যে লোক মাতাল শঠ প্রবঞ্চক অসংযমী ও বিবেকশূন্য, কিংবা এদের যে কোন একটি, তার মধ্যে সৌন্দর্যস্পৃহা থাকা কি সম্ভব? ভালোবাসতে সে কি পারে? অসংযত অন্যায় জীবনযাপনে যে অভ্যস্ত সে তো অসৌন্দর্যের সঙ্গে অপ্রেমের সঙ্গে নিত্য ঘর করছে; একই কালে সে কেমন করে সৌন্দর্যপিপাসু বা প্রেমিক হয়?

এমন কিছু অসঙ্গত প্রশ্ন নয়। কিন্তু মানবস্বভাব এমনই বিচিত্র যে কোনরকম ধরাবাঁধা নিয়মের দ্বারা তাকে বুঝি কোন সময়েই আবদ্ধ করা

চলে না। পৃথিবীতে যত মানুষ তত চরিত্র। মুখের অবয়ব সকলেরই একরকম, কিন্তু কোন দুটি মুখই যেমন এক নয় তেমনি মনুষ্যভেদে স্বভাবেরও ভিন্নতা। কাজেই মানুষকে আমরা নিয়মের দ্বারা বাঁধব কিসে। যে সকল 'সামান্য' ধর্মের জন্য মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় তার সংখ্যা অশেষ নয়। কতকগুলি চিহ্নিত আর সুনিরূপিত বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে মানুষের এই 'সামান্য ধর্মের' সৌধ গড়ে উঠেছে। কিন্তু তার বাইরেও মনুষ্যস্বভাবের বিরাট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। সেখানে পূর্ব-নির্ধারিত সূত্র অনুযায়ী চলতে গেলে পদে পদে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা ফরমুলার দ্বারা আমরা বড় জোর মানুষের কতকগুলি মৌলিক বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে নির্দেশ করতে পারি, তার বেশি নয়। সকল ক্ষেত্রে যেমন এই ক্ষেত্রেও তেমনি, ফরমুলার দৌড় একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত। মনুষ্য-মনের যে বিরাট অনাবিষ্কৃত জগৎ সেই সীমার বাইরে বিস্তারিত এবং আধো-আলো আধো-অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন, সেখানে পথ চলা সহজ নয়। মানুষের সঠিক স্বরূপের পরিচয় নিতে হলে মনের সকল স্তরে কৌতূহলী দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। সচেতন অচেতন অর্ধ-অচেতন নানাবিধ স্তর নিয়ে মানুষের এই মন। বিচিত্র চোরাগলিসম্পন্ন এই রহস্যময় মনের যে প্রকৃত সন্ধান জানে তার পক্ষেই একমাত্র জোর করে বলা সম্ভব, কে কোন জাতের মানুষ, কে ভালো কে মন্দ। কিন্তু তেমন সূক্ষ্মদর্শী অন্তর্জ্ঞান যুক্ত ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল।

সাদা চোখে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে এই, প্রতি মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ জড়িয়ে মিশিয়ে আছে, কারুর মধ্যে ভালোর উপাদান বেশি কারুর মধ্যে কম। সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য মিথ্যা-সত্য নির্বিবেকত্ব-বিবেকবত্তা একই ব্যক্তিত্বের আধারে বিধৃত থাকবার দৃষ্টান্ত সংসারে ভূরিভূরি। ইতিহাস এবং সাহিত্যের পাতায় এই রকম দৃষ্টান্তের বিবরণ

প্রচুর ছড়িয়ে আছে। রোম নগরী দগ্ধ হবার কালে নীরোর বেহালা-বাদনের দৃষ্টান্ত স্মরণ করুন। আমাদের দেশের চাণক্য পণ্ডিতের ক্ষুরধার মনীষা নিরঙ্কুশ কূটবুদ্ধির দ্বারা কলঙ্কিত ছিল। আলেকজাণ্ডারের চরিত্রে উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সা আর বিজিগীষার পাশে পাশে প্রবল বিদ্যানুরাগ আর গুণগ্রাহিতা ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। নেপোলিয়নের মধ্যে উৎকট উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দুর্জয় সাহসিকতার বিসদৃশ সমাবেশ ঘটেছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা অত্যুগ্র হলে তা প্রচণ্ড দোষে পরিণত হয়। উৎকট স্বার্থপরতার আবরণে সে তখন বহু মানবের দুঃখের কারণ হয়। নেপোলিয়নের মধ্যে এ দোষ পূরা মাত্রায় ছিল। তাই বলে তাঁর সত্যিকার প্রেমিক হতে বাধে নি। অতীত, মধ্য এবং সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস থেকে এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে দেখানো যায়, যে লোক মন্দ সে একই কালে ভালোও বটে, পক্ষান্তরে ভালো লোকের ভিতর মন্দ গুণের অবলীলায়িত সমাবেশের দৃষ্টান্তেরও কিছু অসদ্ভাব নেই।

শিল্প সাহিত্যের নজীর থেকে এ কথা আরও ভালো করে বোঝানো যায়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক বেকনের 'মহামতিত্ব' মহা-অকৃতজ্ঞতার সহিত যুক্ত হয়ে অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের নিদর্শনরূপে আজও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। রুশোর সমাজহিতৈষণা আর বিপ্লবী মনোভাব নানারকম চারিত্রিক দুর্বলতার দ্বারা খণ্ডিত ছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি ভিলোঁ-র চোর অপবাদে কারাগারে যেতে হয়েছিল। ইংলণ্ডের কবি বায়রণ এবং ইতালীয় কবি দানুৎজিও দুজনেই 'সহস্র শয্যার নায়ক' ছিলেন, আবার দুজনেই ছিলেন সত্যিকার দেশপ্রেমী ও সাহসী বীর। হ্যারিয়েটের প্রতি শেলীর বিশ্বাসঘাতকতা মর্মপীড়াদায়ক। স্তেধঁল, ফ্লবেয়র, বালজাক, মোপাসাঁ—এঁদের সকলেরই ব্যক্তিগত জীবন নানারকম চারিত্রিক অসঙ্গতির দ্বারা পূর্ণ ছিল। অস্কার ওয়াইল্ড

ও আঁদ্রে জিদের রুচিবিকারের কাহিনী সুবিদিত। রুশ দেশের অমর কবি পুস্কিন 'ডুয়েলে' নিহত হয়েছিলেন। ডষ্টয়েভ্স্কি নানাদিক থেকে নির্বিবেক মানুষ ছিলেন, উপরন্তু তাঁর ছিল উৎকট জুয়া খেলার রোগ। কিন্তু তিনিই আবার ছিলেন স্বদেশ-প্রেমী, বিপ্লবী, দেশের জন্য নির্বাসন-বরণ-কারী এবং Crime and Punishment আর The Brothers Karamazov-এর ন্যায় দুখানি অমর উপন্যাসের স্রষ্টা। ইউরোপের চিত্রশিল্পী আর সঙ্গীতকারদের জীবনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের দেশের সাহিত্য আর শিল্পসাধনার ইতিহাস থেকেও এ কথার অল্পবিস্তর প্রমাণ দেওয়া যায়। কিন্তু তার বোধ করি আবশ্যকতা নেই। এই নিবন্ধে দৃষ্টান্তপঞ্জী সংকলন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের শুধু বলবার কথা এই যে, সদ্‌গুণের সঙ্গে অসদ্‌গুণের সমাবেশ এ পৃথিবীতে হামেসাই ঘটে থাকে এবং এ জাতীয় সমাবেশ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্রে প্রায়শ চোখে পড়ে। খতিয়ে দেখতে গেলে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্রেই এটি বেশি পরিমাণে ঘটে থাকে। তার কারণ, পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থাটাই এমন যে, এখানে কাউকে বড় হতে গেলে তাকে চরিত্রের কিছুটা স্বাভাবিক অংশ বিসর্জন দিয়ে বড় হতে হয়। এ ছাড়া বড় হওয়ার অন্য উপায় নেই। বড় হওয়ার তাড়নায়, এবং বড় হওয়ার চেষ্টার ধকলে মানুষের স্বভাব প্রায়ই বেঁকেচুরে দুমড়েমুচড়ে যায়। পৃথিবীর কৃতী মানুষদের জীবন অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ নন। তাঁদের ভিতর সদ্‌গুণের অংশ যেমন প্রবল, তেমনি পাত্রভেদে অসদ্‌গুণও বড় কম লুকানো নেই। এটাকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে গণ্য করা চলে না অবশ্য, তবে মোটামুটিভাবে বিবৃতিটুকু সত্য। মহতেরা মহৎ ব্যক্তি বলেই তাঁরা গুণবানও বটে, অগুণীও বটে। তাঁদের

চরিত্রে দোষের অংশ অবশ্যই কম—তা না হলে তাঁরা মহৎ বলে কীর্তিত হতেন না—কিন্তু তাঁদের চরিত্রে যে ক'টি দোষ থাকে সেগুলি মোক্ষম। আমি মহাজনদের 'ফ্যাড্' কিংবা বাতিকের কথা বলছি না, সত্যিকার দোষের কথাই বলছি। (খেয়াল বা বাতিক মহাজনদের চরিত্রের ত্রুটীগুলিকে সহনীয় করে তোলবার একটা মস্ত সহায়। মহাজনরা অর্ধ-সজ্ঞানভাবে এইভাবেই তাঁদের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করেন।) দৃষ্টান্তস্বরূপ চার্চিলের নাম করা যেতে পারে। চার্চিল সাহেব নিঃসন্দেহে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তান। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, অসম সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা, বাক্‌পটুত্ব, রচনাকুশলতা সবই গাল ভ'রে তারিফ করবার মতো গুণ। কিন্তু তাঁব একগুঁয়েমি? সেটি প্রায় অবুঝ শিশুর গোঁর মতো—কোন যুক্তি মানে না, কোন বারণ মানে না। সাম্রাজ্য-প্রেমিক একরোখা চার্চিল স্বাভাবিক চার্চিল থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি এই একরোখামি প্রায় মস্তিষ্কশূন্যতার কোঠায় গিয়ে পড়ে। তবু চার্চিল নামটিকে কারও ভোলবার যো নেই। বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের সুনামমণ্ডিত এই নাম বহু মানবের মনে আজও রোমান্টিক মোহের সৃষ্টির কারক। উপরন্তু তাঁর আছে দুটি সুপরিচিত বাতিক—রাজমিস্ত্রীগিরি আর জলরঙ ছবি আঁকার অভ্যাস। এ দুটি শখ চার্চিল সাহেবের ব্যক্তিত্বকে জনসাধারণের চক্ষে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাঁর দোষ এর পিছনে ঢাকা পড়েছে।

মহাজনদের মধ্যে গুটিকয় হলেও মহদ্দোষ কেন জন্ম নেয় সেটি আরও বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

সমাজে যাঁরা সাধারণ স্তরের মানুষ রূপে পরিচিত তাঁদের ভিতর গুণেরও আধিক্য নেই দোষেরও আধিক্য নেই। তাঁদের চরিত্রে দোষগুণ প্রায় সমান-সমান, এবং একটি অপরটির কর্তক। সে

দোষগুণও আবার সাধারণ দোষগুণ, কোনটাই চোখ-ধাঁধানো নয়। Mediocre শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল স্বল্প শক্তি বা গুরুত্বসম্পন্ন মানুষ। তার মানে মহৎ দোষগুণবিরহিত মানুষ। সত্যিই তো, যার মধ্যে চিত্তচমকপ্রদ গুণাবলী বা আতঙ্কসৃষ্টিকারী দোষাবলীর অভাব, সমাজের চক্ষে তার গুরুত্ব হবে কিসে। শক্তিই বা তার অধিগত হবে কেমন করে? সকলের ভাবনা একা ভাবতেন বলে গান্ধীজী ছিলেন 'জাতির জনক' এবং সর্বমান্য ; সন্তানের জনক তো ঘরে ঘরেই রয়েছে, সে কার চোখে পড়ে? অপর পক্ষে, আলেক্‌জাণ্ডার মহাদস্যু ছিলেন বলেই ইতিহাসে শক্তিমান রূপে কীর্তিত ; সাধারণ দস্যুকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অবশ্য আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের কথা আলাদা।

এখন কথা হচ্ছে, কোন একটা ক্ষেত্রে বিরাটত্ব অর্জন করতে গেলেই মানুষকে স্বভাবের কয়েকটি দিক উপবাসী রাখতে হয়। Mediocreদের সে দায় নেই। তাঁরা প্রীতিপ্রণয়স্নেহ-হিংসাদ্বেষঘৃণাপূর্ণ সাধারণ মানুষ ; স্বাভাবিক প্রবৃত্তির খাতে তাঁদের দিনানুদৈনিক অভ্যস্ত-মসৃণ জীবনযাত্রা। তাঁরা সামাজিক আর পারিবারিক কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করেন বলেই mediocre। সামাজিক বা পারিবারিক কর্তব্যে ঢিল দিয়ে কোন বিশেষ বিষয়ের বা বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনায় যদি তাঁরা নিয়োজিত থাকতেন, তবে আর কেউ সাধারণের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকতেন না, চড়চড় ক'রে সামাজিক প্রতিষ্ঠার মই বেয়ে উপরে উঠে যেতেন। এই যুক্তি অনুসরণ করে বলতে হয়, সমাজে যারা সাধারণ দশজন নামে পরিচিত তারা সব চাইতে কম spectacular, কিন্তু সব চাইতে বেশি কর্তব্যপরায়ণ। (উপযুক্ত বাংলা শব্দের অভাবে spectacular কথাটাই ব্যবহার করলাম, পাঠক মার্জনা করবেন। বোধ করি 'চক্ষুচমকপ্রদ' কথাটা চলতে পারে।) সাধারণ দশজনার মধ্যে

উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদ তেমন নেই বলেই তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতা বাধাশূন্য, সুতরাং নির্দোষ। কিন্তু কীর্তিমানদের সম্পর্কে এ কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। কোন একটা আদর্শ বা লক্ষ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে হয় তাঁরা নিজেকে বঞ্চিত করেন, নয়তো পরিবারের মানুষদের বঞ্চিত করেন, নয় স্বজনবন্ধুবান্ধবদের ক্ষতিগ্রস্ত করেন। অত্যুগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতার নামান্তর। উচ্চ আদর্শবাদের সম্পর্কে অবশ্য এরকম একটা অপবাদ দিতে দ্বিধা হয় কিন্তু কার্যত তার প্রক্রিয়াটাও অপরের পক্ষে বড় সুখকর নয়। অনেককেই এ জন্য দুঃখ পেতে হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাড়িত মানুষের চোখে স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রেম, স্বজনবন্ধুদের প্রীতি অতি সামান্য ব্যাপার। প্রয়োজনে এই প্রেম-প্রীতিকে দলতে সে দ্বিধা করে না। আদর্শবাদী মানুষও কতকগুলি ব্যাপারে নিরঙ্কুশ। স্বীয় লক্ষ্য সাধনের উন্মাদনায় তিনি প্রায়ই বাস্তবকে অগ্রাহ্য করেন, আর বাস্তবকে অগ্রাহ্য করতে চাওয়ার অর্থই হল প্রত্যক্ষ-সম্পর্কিত অনেকগুলি মানুষের দুঃখের কারণ হওয়া। স্বভাবতঃ স্বপ্নজগতে যিনি বিচরণ করতে ভালোবাসেন তার পক্ষে নিতান্ত মর্তজগতের মানুষ আপনার জনদের সুখদুঃখের প্রতি সম্যক যত্নপর হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ। আর শুধু যে লক্ষ্য সাধনের চেষ্টারত কালেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা আদর্শবাদী মানুষ অনেকের দুঃখের কারণ হন তা-ই নয়, লক্ষ্য সাধিত হবার পরেও তাঁরা অজ্ঞাতসারে অপরের অভিযোগের কারণ সৃষ্টি করেন। কীর্তিমানের ছত্র-ছায়াতলে যাঁদের বাস করতে হয় তাঁদের ব্যক্তিত্বের সম্যক স্ফুরণ হয় না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কীর্তিমানের কীর্তির মহিমার দ্বারা তাঁদের আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হয়—কেউ স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ ঘটান, কেউ কীর্তিমানের প্রশ্নহীন সেবার মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির উপলক্ষ খোঁজেন।

পৃথিবীতে পুরাতন কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই রকমই হয়ে আসছে। কীর্তিধর মানুষদের দ্বারা সমাজের, দেশের প্রভূত উপকার হয় নিঃসন্দেহ, সমাজের প্রতিটি মানুষ তার ফলে পরোক্ষভাবে উপকৃত হয় সে কথাও ঠিক; কিন্তু আশু যাঁদের কীর্তিধর ব্যক্তির সান্নিধ্যে জীবনযাপন করতে হয় তাঁদের জীবনে সমূহ বঞ্চনা ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

এইটেই নিয়ম। এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ দেখি না। বড় কিছু পেতে হলে তার জন্যে মূল্য দিতেই হবে। কতিপয়কে বঞ্চনা না করলে একের প্রতিষ্ঠা এ সমাজে সুগম হয় না। প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিমাত্রই জীবনে কাউকে না কাউকে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে—দুঃখ দিয়েছেন, বঞ্চনা করেছেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে যদি প্রতি-যোগিতার তাড়না না থাকত, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা অন্যায়-অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত না হত, মানুষ অল্পে তুষ্ট থাকত আর স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আমল না দিত, তা হলে এরকমটি হত কিনা সন্দেহ। বঞ্চনাই যেখানে ভিত্তি, সেখানে সকল কাজেই অল্পবিস্তর বঞ্চনা অবধারিত।

বলতে পারেন, ভালো ও মন্দের প্রসঙ্গের সঙ্গে এ প্রসঙ্গের সম্পর্ক কী। সম্পর্ক নিশ্চয়ই একটা আছে, আমার বক্তব্য হচ্ছে, সমাজে যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি রূপে মান্য, তাঁদের কেউ পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ নন। কঠিন প্রতিযোগিতাপূর্ণ সংসারে আত্মোন্নতির চেষ্টায় তাঁদের স্বভাব বেঁকেচুরে তুমড়ে গেছে। তাঁরা বড় হয়েছেন সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে বড়ত্বের জন্যে অনেকখানি মূল্য সমাজকে ধরে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অপরকে তো বঞ্চিত করেছেনই, কোন কোন দিক দিয়ে নিজেকেও বঞ্চিত করেছেন। তাঁদের ভালোত্ব নির্বিশেষ ভালোত্ব নয়, তার ভিতর মন্দের খাদ মিশে আছে। সে খাদ অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত না হতে পারে, কিন্তু রঙ তার গভীর কালো।

ভালো-মন্দের প্রসঙ্গে আরও একটা কথা সকলকে ভেবে দেখতে বলি। বিষয়টি যথেষ্ট পরিমাণে ভেবে দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমরা সারল্যকে একটা মহাগুণ বলে কীর্তন করি। সরল ব্যক্তির প্রশংসা আমাদের মুখে ধরে না। কিন্তু সত্যই কি সারল্যের এত দূর প্রশংসা প্রাপ্য? আমার তো মনে হয়, সারল্য অজ্ঞতারই প্রকারভেদ মাত্র। যে ব্যক্তি বয়সে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও পাপকে জানল না অশুভকে চিনল না, চির-জীবন স্বভাব-সরল থেকে গেল, তার বুদ্ধি পরিণত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। এ হেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্ধস্ফুট থেকে যেতে বাধ্য। অশুভকে চেনে না বলে অশুভকে জয় করবার কৌশলও তার অনায়ত্ত থাকে। ফলে অশুভের সংস্পর্শে আসামাত্র তার পদস্খলন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে তার সারল্য তাকে এতটুকুও রক্ষা করতে পারে না।

পৃথিবীতে বাঁচতে হলে মন্দকে জানা চাই, বোঝা চাই। এবং সে মন্দকে অতিক্রম করবার শক্তি আয়ত্ত থাকা চাই। তবেই একটা মানুষ গোটা মানুষ হয়ে উঠতে পারে, নয়তো স্বভাব-সরল মানুষ শুধু যে অজ্ঞান মানুষ তা-ই নয়, সে অবিবেচক মানুষও বটে। এমন কি তাকে হৃদয়হীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমি যদি পাপের স্বরূপ উপলব্ধি না করি, কী অবস্থায় পড়লে মানুষ পাপাচরণ করতে বাধ্য হয় বুঝতে না চাই, যদি সকল ব্যাপারে একটা অসম্ভব নীতির মান উন্নত করে রাখি এবং যার আচরণ এই মানসম্মত নয় তাকেই অপরাধী বলে গণ্য করি, সে ক্ষেত্রে সহানুভূতি, করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি আমার মধ্যে জন্মাতে পারে না। পাপীর প্রতি ঘৃণার বদলে পাপীর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক তখনি হতে পারে যখন বুঝব, পাপ জিনিষটা অবস্থাগতিকেই মানুষ করতে বাধ্য হয়, পাপ কারও সহজাত নয়; যখন বুঝব পাপের

জন্য নিজের দায়িত্ব যত না তার চাইতে পারিপার্শ্বিকের দায়িত্ব, বংশক্রমের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি; যখন বুঝব, প্রত্যেক মানুষের দ্বারাই পাপাচরণ সম্ভব, এমনকি যে-আমি নিজেকে অত্যন্ত সাধু-সজ্জন বলে জানি এবং কৃত্রিম একটা নীতির আদর্শ খাড়া করে রেখে তদনুযায়ী সকলের বিচারে প্রবৃত্ত, তার পক্ষেও পাপাচরণ কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। পাপজ্ঞানশূন্য স্বভাব-সরল মানুষ, নীতিবাদী মানুষ, তথাকথিত শুদ্ধাচারী মানুষ প্রায়ই অবিবেচক হন। তাঁরা অপর মানুষকে বুঝতে চান না, মনে করেন তাঁদের জগৎটাই একমাত্র সত্য জগৎ, এই জগতের বাইরে যাদের বিচরণ তারা অমানুষ এবং ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু এর চাইতে অনিষ্টকর ধারণা আর কী হতে পারে? দোষে-গুণে মিলিয়ে আমি যদি মানুষকে ভালোবাসতে নাই পারলাম তবে আর আমার শিক্ষা কী, অভিজ্ঞতা কী। সরল মানুষের অভিজ্ঞতা নেই, সুতরাং হৃদয়ও নেই। যুবকেরা সচরাচর অসহিষ্ণু হয় তার কারণ তাদের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ, শিক্ষা অপূর্ণ; পক্ষান্তরে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা বহুব্যাপক বলে তাঁর পক্ষে ক্ষমাপ্রবণ হওয়া খুবই সহজ। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই তা বলছি না, তবে মোটামুটি ভাবে এ কথা সত্য যে, অভিজ্ঞতাই মানুষকে সহানুভূতিশীল আর ক্ষমাপ্রবণ মানুষে পরিণত করে। ইংরেজিতে যাকে বলে understanding man সেরকম লোক অনভিজ্ঞদের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। পাপ আর পুণ্য এ দুয়েরই অভিজ্ঞতা যাঁর আছে তিনিই শুধু প্রকৃত under-tanding man হতে পারেন। মেয়েরা মাতাল দেখলে ঘৃণায় আঁতকে ওঠে, চোর ধরা পড়লে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতের দল তাকে ধরে চাঁদা করে' মারে, সাময়িক দুর্বলতার বশে কোন যুবতী বিধবার পদস্খলন ঘটলে মূঢ় পিতা তাকে কুলটা বলে দূর করে দেয়—এ সবই হচ্ছে অচেতনতার দৃষ্টান্ত, সুতরাং সঙ্কীর্ণচিত্ততারও বটে। কী কী অবস্থায়

পড়লে মানুষ মাতলামো করে কিংবা চৌর্যপ্রবৃত্তির অধীন হয় তা যদি জানা থাকে, যদি এ কথা উপলব্ধিতে এসে থাকে যে, কামপ্রবৃত্তি বহুদিন অতৃপ্ত থাকলে তা অকস্মাৎ সংযমবন্ধনশূন্য হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়, তা হলে মাতালের প্রতি, চোরের প্রতি, দুর্বলা নারীর প্রতি ঘৃণা রোষ আর দয়াহীনতার বদলে সহানুভূতির উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাপকে প্রশ্রয় না দিতে পারি, পাপীর প্রতি ক্ষমাশীল হতে বাধা নেই। বরং মানবিকতার বিচারে সেইটেই কর্তব্য হওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি চোখ কান খোলা রেখে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, পাপের সংস্পর্শে এসেও যার বুদ্ধিবৃত্তি মলিন হয় নি, তার পক্ষে মানব-দরদী হওয়া যত সহজ এমন আর কারও পক্ষে নয়। শুধু তা-ই নয়, কথাটা আরও একটু বিস্তারিত করতে চাই : পাপের মুখোমুখি যিনি হন নি তাঁর পক্ষে প্রকৃত মানবদরদী হওয়া বোধ করি একরকম অসম্ভব। মানব-সমাজের একটা বৃহৎ অংশ শিক্ষার দোষেই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, নানারকম নৈতিক দুর্বলতার বশ। এই দুর্বলতার স্বরূপ যিনি জানেন না তিনি দুর্বলতাকে ক্ষমা করবেন কেমন করে? পথভ্রষ্ট মানুষকে পথভ্রষ্ট জেনেও ভালোবাসতে পারা—সে শুধু গভীর মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা আর অন্তর্জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে। এই অভিজ্ঞতা আর অন্তর্জ্ঞান এমনিতে হয় না বা একদিনে হয় না, তার জন্যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। অনেক ভুল-পথে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, ঠেকে-শেখার অভিজ্ঞতা, দুঃখের লোনা সমুদ্র পার হওয়ার অভিজ্ঞতা একত্র সম্মিলিত হলে তবে একটা মানুষ সত্যিকার মানবচরিত্রজ্ঞানের সীমানায় পৌঁছাতে পারে। নিজের মনের পরীক্ষা নিজের কাছে যাঁর হয় নি, তাঁর পক্ষে অন্তর্জ্ঞানযুক্ত হওয়া বা অপরের মনে প্রবেশের চেষ্টা দুরাশা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে মহামানব গান্ধীজীর সারল্য বিবেচ্য। গান্ধীজীর চরিত্রে

যে সরলতা, তা তথাকথিত স্বভাব-সারল্য নয়, সুগভীর মানবচরিত্রজ্ঞানের ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত। আর এই কারণেই সে সারল্য আমাদের মনকে এমন সুদৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে। অনেক বেদনার অভিজ্ঞতা, ভুলভ্রান্তির অভিজ্ঞতা, আত্মপরীক্ষার অভিজ্ঞতা দু হাতে ঠেলে পার হয়ে তবে গান্ধীজী এই মহা-আকাঙ্ক্ষিত সারল্যের তীরে পৌঁছেছিলেন। এ সারল্য বুদ্ধির সুষমার দ্বারা দীপ্ত, বোধির দ্বারা অনুপ্রাণিত। আত্মোপলব্ধি না হলে এ জাতীয় সারল্য কারও অধিগত হয় না।

গান্ধীজী প্রকৃত ক্ষমাশীল মানব ছিলেন। পাপকে তিনি ঘৃণা করতেন, পাপীকে কদাচ নয়। তার অর্থ, মানুষ কোন্ কোন্ অবস্থায় পড়লে পাপ করতে বাধ্য হয় তার তত্ত্ব তিনি জানতেন। সুগভীর সহানুভূতির দ্বারা তিনি বুঝেছিলেন, পাপের জন্য পাপীর নিজের দায়িত্ব যত না তার চাইতে অবস্থার দায়িত্ব অনেক বেশি। পাপীই হোক আর পুণ্যবানই হোক, এ সংসারে সকল মানুষ অবস্থার দাস, অবস্থাই মানুষের সুকৃতি-দুষ্কৃতিকে মুখ্যাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বীয় জীবন দ্বারা পাপপুণ্যের এই তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সর্বক্ষেত্রে ক্ষমাবোধ দ্বারা চালিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

গান্ধীজী অহিংসার বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তার অর্থ কি এই যে তিনি হিংসার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না? হিংসা মানুষেব কত বড় রিপু তা তিনি সম্ভবতঃ নিজের মনোজীবনে আর সকলের অপেক্ষা একটু বেশি করেই উপলব্ধি করেছিলেন। অনুমান করি, হিংসার প্রত্যেকটি স্তর তিনি মনোজীবনে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং হিংসার ভয়াবহ অন্তিম চেহারা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। তা নয়তো এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে এমন একমুখী নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি জীবনভোর হিংসার অসারতা প্রচারে আত্মনিয়োগ করতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক

জীবনে সংযম-আচরণের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার উপর বরাবর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটিও অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। অসংযমের চেহারা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন, এ কথার সাক্ষী তাঁর আত্মজীবনী। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু জেনেছিলেন বলেই তাঁর নির্দেশসমূহ এমন মূল্যবান আর তাঁর প্রেম এত গভীর।

সমকক্ষতার ভিত্তি

সম্প্রতি কোন একটি ইঙ্গ-ভারতীয় ইংরেজী দৈনিকের চিঠিপত্র স্তম্ভে দার্শনিক সোপেনহয়েরের নারী-বিদ্বেষ সংক্রান্ত কয়েকটি সুপরিচিত উক্তিকে কেন্দ্র করে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারবাদ সম্পর্কে এক পশলা বাদানুবাদ হয়ে গেল। বিতর্কটি অত্যন্ত পুরনো। সভ্যতার অগ্রগতি বিধানে পুরুষের প্রতিভা সমধিক কার্যকর হয়েছে, না এক্ষেত্রে নারী জাতির প্রতিভার দান বেশী—এই অতি পুরাতন সমস্যার পুনরবতারণা করা হয়েছে ওই বিতর্কের মধ্যে। সেই পুরাতন কাসুন্দি নতুন করে চটকাবার মনুষ্যসুলভ দুরারোগ্য অভ্যাস। স্পষ্টতঃই বিংশ শতাব্দীর মধ্য সীমারও পরে এ জাতীয় বিতর্কের পুনরবতারণার কোন আবশ্যকতা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার বর্তমান সমাজে কার্যত সর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত না হলেও উক্ত আদর্শের অন্তর্নিহিত নীতির সারবত্তা সম্পর্কে আজ আর কোন মহলে মতদ্বৈধ নেই। প্রত্যেক সুসভ্য দেশের রাষ্ট্রিক সংবিধানের ভিতর স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার আজ একটি মূল নীতিরূপে স্বীকৃত ও সংগ্রথিত ; ভারতীয় সংবিধানেও একই আদর্শের জয় ঘোষণা। গান্ধীজী যে রাষ্ট্রশাসনবিবর্জিত সমসমাজ-ব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন, তার একটি মূল কথাই ছিল স্ত্রী-পুরুষের এই সমান অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতৃগণ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার ভিতর নীতিগতভাবে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করে নতুন কিছুই করেন নি—জাতির জনকের সুমহান্ ইচ্ছাকে মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

নারী ও পুরুষের অধিকারের প্রশ্ন এই যদি সমগ্র সুসভ্য পৃথিবীর সর্ব-

সম্মত সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে আর এই মুহূর্তে উভয়ের মর্যাদার কল্পিত তারতম্য বিচারের সূত্রে দার্শনিক সোপেনহয়রকে কবর খুঁড়ে বার করা কেন। সোপেনহয়রের নারী বিদ্বেষ সংক্রান্ত উক্তিগুলি আজকের দিনে অচল। বিচক্ষণ পাঠক যখন সোপেনহয়রের দর্শন আলোচনা করেন, তখন সেই দর্শনের ফাঁকে ফাঁকে অনুস্যূত এই সকল পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যগুলিকে বাদ দিয়েই সে আলোচনা করেন। বিচক্ষণ পাঠকের এবম্বিধ আচরণের কারণ এই যে, সোপেনহয়রের নারী বিদ্বেষের আদর্শগত কোন ভিত্তি ছিল না, ওটি নিতান্তই ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ততাপ্রসূত। সোপেনহয়র কখনও মায়ের স্নেহ পান নি; মায়ের প্রতি সন্তানেরও ভক্তিবিগলিত হবার কোন কারণ ছিল না। বুদ্ধিমতী এবং বিদুষী হয়েও সোপেনহয়রের মা ছিলেন অতিমাত্রায় দাম্ভিক ও আত্মপরায়ণা। মায়ের এই অত্যুগ্র আত্মপরায়ণতার চড়ায় ঠেকে সন্তানস্নেহ বার বার প্রতিহত হয়েছে। মায়ের সঙ্গে এক সুবিদিত কলহের পর সোপেনহয়র সেই যে গৃহত্যাগ করেছিলেন জীবনে আর কখনও মায়ের মুখদর্শন করেন নি। উল্লিখিত অপ্রীতিকর ঘটনার পর সোপেনহয়র-জননী আরও চব্বিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। এ থেকেই মাতা ও পুত্রের পারস্পরিক বিদ্বেষের উগ্রতা অনুমান করা যেতে পারে।

স্পষ্ট বোঝা যায়, সোপেনহয়রের এই মাতৃ-বিদ্বেষই পরবর্তী কালে তাঁকে প্রত্যক্ষ নারী-বিদ্বেষীতে রূপান্তরিত করেছিল। সোপেনহয়রের জীবনী ও দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে উইল ডুরাণ্ট লিখেছেন—

"A man who has not known a mother's love—and worse, has known a mother's hatred—has no cause to be infatuated with the world." (*The Story of Philosophy*)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবনে কখনও মাতৃস্নেহ পায় নি, উল্টো মায়ের

ঘৃণা পেয়েছে, পৃথিবী সম্পর্কে মোহমুগ্ধ হবার তার কোন কারণ থাকতে পারে না। কবি বায়রণের জীবনেতিহাসের মধ্যেও আমরা একই সত্যের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। সোপেনহ্যর কিংবা বায়রণ যে জাতীয় আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, সেই মানসিকতার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হল—নৈরাশ্যবাদ। আর উভয়ের বেলায় এই তিক্ত নৈরাশ্যবাদের উৎসমূল থেকেই যে নারীবিদ্বেষের গরলস্রোত উচ্ছ্বিত হয়েছে, সে কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করা ভালো, আমাদের দেশের শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে নারীর সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মনু নারীকে নরকের দ্বার বলেছেন। মনুসংহিতায় নারীর সহজাত অধিকার ও মর্যাদা অস্বীকৃত, পক্ষান্তরে নারীকে তার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার অনুকূলে কিছু কিছু অপযুক্তি (আজকের মানদণ্ডে) সেখানে দর্শানো হয়েছে। শাস্ত্রোক্ত 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' নীতির ভিতরের কথা সম্ভবতঃ এই যে, পুরুষের চোখে নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদার বিশেষ সার্থকতা নেই ; সমাজের নিকট নারীর ততটুকু মর্যাদা প্রাপ্য, সন্তানের জনয়িত্রী হিসাবে যে মর্যাদা তাঁকে না দিলেই নয়। অর্থাৎ পুরুষ-প্রভুর নিকট নারী সন্তান-উৎপাদনের অপরিহার্য যন্ত্র বই নয়। নারীর সম্পর্কে এই ধরনের মনোভাবের প্রবলতার কারণে দীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজে নারীর আত্মবিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, এই ঐতিহাসিক তথ্যকে আজ আর কথার কথা বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।

ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলি জ্ঞানগর্ভ উক্তিতে পরিপূর্ণ, তবু যে শাস্ত্রকাররা নারীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এ জাতীয় অনুদারতার প্রশ্রয় দিয়েছেন, তার একমাত্র হেতু সনাতন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতর পুরুষের অপ্রতিহত প্রভাব। পুরুষশাসিত সমাজ-

ব্যবস্থায় নারী সম্পর্কে ভিন্নতর মনোভাব পোষণের হেতু ছিল না। বৈদিক এবং তৎপরবর্তী যুগে নারী স্বীয় মেধা ও বিচক্ষণতার বলে কৃতিত্ব তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, এমন কিছু কিছু দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির অভ্রান্ত মাপকাঠি মনে করলে অনুচিত ধারণা পোষণ করা হবে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসখ্যাত নারী জাগরণের দৃষ্টান্তগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনার অতিরিক্ত মর্যাদা বুঝি দেওয়া চলে না।

সুখের বিষয়, উনিশ শতক থেকে নারী সম্পর্কিত প্রাচীন অনুচিত ধারণার দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন হয়েছে। কিছুটা পাশ্চাত্য সাহিত্যের খাত-বাহিত উদারনীতির সংস্পর্শে, কিছুটা ভারতীয় সাধনার অন্তর্গত মানবতাবাদী ধারার প্রভাবে, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার নীতি ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তারাজ্যে অধিকার বিস্তার করল। রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রমুখ মনীষী ও কর্মিগণ সংস্কারমুক্ত মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে এই ক্ষেত্রে যে বলিষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন, আজ বহু বৎসরের ব্যবধানে তার পূর্ণ ফল ফলতে শুরু করেছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য নীতি এ-কালীন চিন্তাধারায় আদৌ আর স্বীকৃত নয়। এখন যদি কেউ পুরুষের তুলনায় নারীকে সহজাতভাবে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে নিবন্ধ রচনা করেন, তিনি সকলের উপহাসাস্পদ হবেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতির প্রসাদে এ কথা আজ নিঃসংশয়িত-রূপেই প্রমাণিত হয়েছে যে, দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষের সমকক্ষ না হলেও ধী, ধৃতি ও সহিষ্ণুতার শক্তিতে নারী কোন অংশেই পুরুষের তুলনায় খাটো নয়। আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ ও ক্ষেত্র পেলে সন্তানবহনের সহজাত অসুবিধা সত্ত্বেও যে নারী পুরুষের সমকক্ষ হতে

পারে তার বহু নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে ছড়ানো আছে। সোপেনহ্যর জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, নারী হল জাতি (species) সংরক্ষণের উপায়, প্রকৃতির সূক্ষ্ম ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যই নারীজাতির অস্তিত্ব। নারী তার যৌবনমোহ আর ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের ছলাকলার দ্বারা পুরুষের মনে সাময়িক বিভ্রম জাগায়, সে শুধু ওই প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায় চরিতার্থ করবার জন্যে। নারীর ক্ষেত্রে এই বিভ্রমসৃষ্টির লীলা অর্ধসচেতন, অর্ধ-অচেতন। পুরুষকে ফাঁদে ফেলবার জন্য প্রকৃতির সযত্নরচিত ষড়যন্ত্রের নারী হল সুযোগ্য অংশীদার। নারীর তথাকথিত মোহিনী মায়া আসলে পুরুষচিত্ত জয়ের স্বীকৃত পদ্ধতির প্রাথমিক প্রকরণমাত্র—পুরুষের উপর নারীর অধিকার বিস্তারের প্রক্রিয়া এই দিয়েই শুরু হয়।

সোপেনহ্যরের প্রচারিত এই তত্ত্বের সঙ্গে দেশী বিদেশী অনেক মনীষীরই চিন্তাধারার মিল আছে। বার্নার্ড শ'র 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান' নাটকের আখ্যানভাগের ভিতর পরোক্ষভাবে এই মতেরই সাক্ষাৎ আমরা পাই। অন্যান্য একাধিক নাটক, কবিতা আর গল্পোপন্যাসের ভিতর অনুরূপ মতের আভাস একটু চেষ্টা করলেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ বাদে বিভিন্ন দেশে ও কালে অসংখ্য দার্শনিক নিবন্ধাদিতে এ মতের আলোচনা করা হয়েছে।

দার্শনিক ও শিল্পী শ্রেণীর মানুষদের প্রচারিত উক্ত মতের সারবত্তা কী পরিমাণ ও কতটা, সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলতে পারব না। এই তত্ত্ব সত্য হতে পারে, ভ্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নিই যে এই মত সর্বাংশে সত্য, তাতেও নারীকে পুরুষের তুলনায় সহজাতভাবে অপকৃষ্ট মনে করবার কোন কারণ নেই। নারী যদি সত্য সত্যই জাতি সংরক্ষণের মূল উপায়রূপে পুরুষের সহযোগীর

ভূমিকায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তার সেই ভূমিকাকে নারীর স্বভাবসিদ্ধ জৈব ভূমিকা মনে করলেই সকল ল্যাঠা চুকে যায়। এর সঙ্গে নারীর বুদ্ধি ও মেধাগত জীবনকে গুলিয়ে ফেলবার কী কারণ থাকতে পারে? নারীকে যে এতকাল নিতান্ত অসঙ্গতভাবে পুরুষের তুলনায় স্বতঃই অপকৃষ্ট মনে করা হয়েছে সে শুধু এই কারণে যে, নারীর জৈব ভূমিকার বাইরে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা কারও মনে হয় নি। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশ এবং সমাজের মানুষের প্রবহমান চিন্তাধারাও এই ব্যাপারে নারীর স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। নারীর সম্পর্কে কুসংস্কার যেখানে প্রবল ও সর্বব্যাপী, সে স্থলে নারীজাতির অনুকূলে সুস্থ মনোভাব গড়ে উঠবার বিশেষ হেতু এতাবৎ ছিল না। সমাজজীবনে এ জাতীয় উপলক্ষও খুব কম ঘটেছে। বহুকাল পর্যন্ত নারী গৃহবদ্ধ থাকায় এবং সন্তান বহনে ও সন্তান পালনে তার মূল মনোযোগ ও শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় বহু মানুষের মনে এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রকৃতিনির্দিষ্ট জৈব দায়িত্ব পালন ছাড়া নারীর আর কোন করণীয় নেই। কিন্তু একটু মোহমুক্ত মন নিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, নারীর জৈব ভূমিকা তার ব্যক্তিত্বের একটি অংশ মাত্র, নারীর জৈব ভূমিকাতেই নারীর নারীত্ব নিঃশেষিত নয়। দৈহিক বল-শালিতা ও পরাক্রম পুরুষ জাতির বৈশিষ্ট্য হলেও যেমন পুরুষের পৌরুষ তাতেই শেষ হয়ে যায় না, তার বাইরেও তার আত্মবিকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে আছে, তেমনি নারীর সম্পর্কেও ঐ কথা। সন্তান বহন ও সন্তান পালন নারী জাতির স্বাভাবিক বৃত্তি, তা বলে তার বাইরে তার আর কোন করণীয় থাকতে পারে না এমন কোন কথা নেই। জীবনের এমন বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে পুরুষ ও নারী স্বচ্ছন্দে সাধারণভূমিতে এসে দাঁড়াতে পারে এবং একে অপরের সমকক্ষ হতে পারে। শিল্প

সাহিত্য দর্শন রাজনীতি বিজ্ঞান এইরূপ কতকগুলি সাধারণ ক্ষেত্র যেখানে স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা এক। সামর্থ্যও সম্ভবতঃ এক।

'সম্ভবতঃ' বলছি এ কারণে যে, এখন পর্যন্ত এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষের কৃতিত্বটাই সমধিক চোখ-ধাঁধানো হয়ে আছে। শিল্প সাহিত্য ইত্যাদিতে নারীর কৃতিত্ব আরও ফলপ্রদভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা রাখে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এ সকল বিষয়ে নারীর সামর্থ্য অল্পবিস্তর সম্ভাব্যতার স্তরেই রয়ে গেছে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সেই সম্ভাব্যতা চিরকাল সম্ভাব্যতাই থাকবে, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চায় পুরুষ যে অপরিমিত সুযোগ এতকাল পেয়েছে স্ত্রীজাতিকে তার সঙ্কীর্ণ গৃহের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে এনে তার কিছুটা অংশ যদি দেওয়া যেত, নারীর পক্ষে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া বোধ করি এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর জৈব ভূমিকার ভিন্নতা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, জৈব বিষয়-নিরপেক্ষ অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষের তুলনায় নারীকে অপকৃষ্ট মনে করবার কোনই হেতু নেই। না যুক্তির হেতু, না সাক্ষ্য-প্রমাণগত হেতু। আদর্শবাদ যদি পুরুষের বেলায় একটি মহৎ গুণ বলে প্রকীর্তিত হয়ে থাকে, নারীর সহজাত স্নেহশীলতাও অনুরূপ মহৎ গুণ রূপে প্রকীর্তিত হওয়া উচিত। খতিয়ে দেখতে গেলে, পুরুষের তথাকথিত আদর্শবাদ এক ধরনের একগুঁয়েমি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তাতে তো পুরুষের আত্মসমুন্নতির বাধা হয় না; বরং সুবিধাই হয়। তা যদি হয় তো স্নেহশীলতাই বা নারীর সমুন্নতির সহায়ক হবে না কেন। নারীর স্বাভাবিক মমত্ববোধ, স্নেহদুর্বল মানসিকতা এবং সংরক্ষণশীলতাকে নারীর আত্মবিকাশের পথে স্বতঃই প্রতিবন্ধক মনে করবার কারণ থাকতে পারে না। সাধারণ ব্যবহারিক

কাজেকর্মে, বাহিরের গণ-জীবনে পুরুষ ও নারীর সুবিধা-অসুবিধার পরিমাণ প্রায় সমান-সমান। কাজেই এক্ষেত্রে পুরুষকে স্বতঃই শ্রেষ্ঠতর মনে করবার যুক্তি বুঝে ওঠা দুষ্কর।

আসল কথা, নারীর গৃহবদ্ধ ভূমিকার উপর এতাবৎ মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে। তাকে অন্যায়ভাবে জৈব দায়িত্বপালনের সংকীর্ণ সীমার ভিতর কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। এই অন্যায় কোণঠাসা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব থেকেই সাফ্রাজিষ্ট আন্দোলনের উদ্ভব। সাফ্রাজিষ্টদের মনোভাবে উগ্রতা ছিল, আচরণে সময় সময় উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পেয়েছে, তাদের অতিরিক্ত হাত-পা (সঙ্গে সঙ্গে টেবিল-চেয়ার) ছোড়াছুড়ির এবং জানালার শার্সি ভাঙ্গাভাঙ্গির ভিতর দিয়ে দীর্ঘকালীন হীনমন্যতার বোধটাই প্রধানতঃ বাহিরে রূপ পেয়েছে। কিন্তু নারীর চিরাভ্যস্ত পরাধীন অবস্থা বিবেচনা করলে উক্ত আতিশয্যকে ক্ষমার চোখে না দেখে পারা যায় না। এলেন কেই, লেডী পেথিক-লরেন্স, মার্গারেট কাজিন্‌স্ এবং তদনুরূপ ধীশক্তি-সম্পন্না, সুধীরা অন্যান্য বহু বিশিষ্ট মহিলা যে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাকে নিতান্তই প্রতিবাদসর্বস্ব নঙর্থক তৎপরতা আখ্যা দিয়ে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। স্পষ্টতঃই সে আন্দোলনের ভিতর নঙর্থক তৎপরতার অতিরিক্ত গূঢ় আরও কিছু ছিল যা মহান, উদার, বৃহত্তর কল্যাণ-ধর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার দাবী সেই সম্যক্‌দর্শী কল্যাণ-ধর্মের একটি আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র।

আসলে সাফ্রাজিষ্ট আন্দোলনের মূলে ছিল এই অপ্রতিরোধ্য সুমহান সত্য নীতির প্রণোদনা যে, নারী ও পুরুষের অধিকার এক, অপিচ নাগরিক জীবনের সমভূমিতে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা-সাপেক্ষে নারীর পক্ষে পুরুষের অনুরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করতে না পারার কোনই

কারণ নেই। পরে অবশ্য বার্নার্ড শ' প্রমুখ ব্যঙ্গরসিক লেখক ইংলণ্ডীয় নারীর রাজনৈতিক যোগ্যতার উপর কটাক্ষ করে একাধিক নিবন্ধে নারীর এই সমকক্ষতার দাবী খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে শুধু শ'য়ের পরিহাসতারল্যই প্রমাণিত হয়েছে, নারীর মর্যাদার বিশেষ ব্যত্যয় হয় নি। ন্যায়বান বার্নার্ড শ' সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায় ও মূঢ়তার উপর খড়্গহস্ত ছিলেন সন্দেহ নেই, তবে মূলতঃ তিনিও ছিলেন বুর্জোয়া 'কুলীন'দেরই দলে। পুরুষের আভিজাত্য ও বুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠত্বের কল্পিত ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে তাঁর ন্যায় সম্যক্‌দর্শী মানুষও নারীর শক্তি-সামর্থ্যের উপর অনুচিত কটাক্ষপাত করতে দ্বিধা করে নি।

সোপেনহ্বরের প্রসঙ্গ দিয়ে নিবন্ধের শুরু হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। সোপেনহ্বর যে মূলকারণ বশতঃ নারীজাতির উপর বিরূপ ছিলেন তার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পূর্বেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। শুধু বুদ্ধি বা শক্তি-সামর্থ্যের ক্ষেত্রেই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও সোপেনহ্বর নারীকে পুরুষের তুলনায় স্বভাবতঃ অপকৃষ্ট প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই খাতে সোপেনহ্বরের প্রদর্শিত যুক্তির অনুরূপ যুক্তি যদি কেউ একসঙ্গে পেতে চান, তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর পাতা উল্টাতে অনুরোধ করব। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানীতে 'নারীর রূপ' নিবন্ধে এই প্রসঙ্গটির কিঞ্চিৎ সবিস্তার আলোচনা করেছেন। কিন্তু সোপেনহ্বর নারী জাতির বিরুদ্ধে যা-ই বলুন আরলিখুন, তিনি নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নটিকে মুখ্যতঃ জৈব দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। জৈব জীবনের বাইরে যে সুবিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে আছে সেখানে তাঁর মনোযোগ আপতিত হয় নি বলেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আগাগোড়া একপেশো থেকে গেছে। দৃষ্টির এক-বস্ত্বাভিমুখী সঙ্কীর্ণতা দূর হলে তবেই শুধু স্ত্রী-পুরুষের সমস্যাটিকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা সম্ভব।

অলঙ্কার তত্ত্ব

কিছু দিন আগে অন্ধ্র বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীভেমিয়া এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত অলঙ্কার যাঁরা দেহে ধারণ করেন তাঁদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হোক। সংবাদপত্রে এই নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, তবে মনে হয় বিষয়টি যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সে পরিমাণ মনোযোগ প্রস্তাবটির উপর অর্পণ করা হয় নি। কেউ কেউ প্রস্তাবটিকে 'উদ্ভট' বলেছেন। এমন একটি সঙ্গত প্রস্তাবের মধ্যে উদ্ভটত্ব কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। যে কোন কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রেই অতিরিক্ত সম্পত্তির উপর কর ধার্যের নীতি স্বীকৃত; সমাজের 'অস্তি' এবং 'নাস্তি' শ্রেণীর মধ্যে যে দুস্তর ধনবৈষম্য বর্তমান তাকে নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীতে সংকুচিত করার একটি প্রধান পথ হচ্ছে অস্তিবানদের উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পত্তির উপর কর বসিয়ে তাকে অংশতঃ রাষ্ট্রগত করা। এই উপায়ে সমাজের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন কথঞ্চিৎ বিহিত হওয়া সম্ভব। তা যদি হয় তাহলে শ্রীভেমিয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উদ্ভটত্বের অভিযোগ কেন। সম্পত্তিবানদের অসন্তোষের কারণ বুঝি, সাধারণ মানুষের আপত্তির মর্ম বুঝি না।

স্পষ্টতঃ শ্রীভেমিয়া গহনাবতীদের লক্ষ করে প্রস্তাবটি রচনা করেছেন। গহনাপ্রীতি স্ত্রী জাতির সহজাত, সুতরাং স্ত্রী জাতির এই স্বাভাবিক দুর্বলতাকে খানিকটা প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই দুর্বলতাকে স্বীকার না করলে পারিবারিক জীবনে পুরুষের কাবু হয়ে পড়বার সম্ভাবনা পদে পদে। স্ত্রী যদি গহনার বাবদে 'বিদ্রোহ' করে,

স্বামী বেচারার অবস্থা অল্পতেই কাহিল। ঘরণীকে চটিয়ে ঘর করা যায় না। কাজেই স্ত্রী জাতির গহনাপ্রীতির বিরুদ্ধে কিছু বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। মেয়েরা হাতের কাছে আর যদি কোন গহনা না পায়, একটি ফুল পেলে তাই নিয়ে মাথায় গুঁজবে। শুধু-মাথায় নয়, খোঁপা-করা মাথায়। সুতরাং ব্যাধিটা যেখানে দুরারোগ্য এবং উৎকট, সে ক্ষেত্রে তার প্রতিকারে আপনার আমার কী করবার থাকতে পারে।

তাছাড়া প্রতিকার করতেই বা যাওয়া কেন। স্ত্রীজাতির মণ্ডনপ্রিয়তা এবং সজ্জাবিলাস—তার একমাত্র লক্ষ্য পুরুষ। অলঙ্কার, বিভূষিতা নারীর চারু সৌন্দর্য পুরুষের চোখে খারাপ লাগে এমন কথা বলতে পারি না। পুরুষের চোখে বিভ্রম জাগায় বলেই না নারীর আভরণভূষণের এই তোড়জোড়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা নিজেকে প্রিয়তর করে তোলা যায় এবং যার সার্থকতা অপর পক্ষেও মান্য, তার উপর একতরফা রায় না-ই বা উচ্চারণ করলাম।

কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে অলঙ্কারসজ্জার আতিশয্য নিয়ে। ভালো জিনিসও অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবেশিত হলে নিমন্তিতো হয়ে দাঁড়ায়। রুচি ও পারিপাট্যের একটা প্রধান কথা হচ্ছে ব্যালান্স বা সঙ্গতি। অতিরিক্ত ভারে এই ব্যালান্স ক্ষুণ্ণ হয়। গহনার ভার সৌন্দর্যের ধারকে তীক্ষ্ণ করে না বরং ভোঁতা করে। গহনার উপর গহনার ভার চাপিয়ে যারা নিজেদের অপরের মনোমত করে তুলতে চায় তারা স্বীয় উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে।

দুইটি মূল নীতির কারণে নারীর এই আতিশয্যমণ্ডিত অলঙ্কারবিলাস আপত্তিকর। প্রথমতঃ এতে মানুষের রুচিবোধ পীড়িত হয়, দ্বিতীয়তঃ তা ঐশ্বর্যের উদ্ধত বিঘোষণ। অর্থাৎ সৌন্দর্যনীতি এবং সমাজনীতি এই দুই দিক থেকেই ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু।

সমাজনীতির প্রসঙ্গ আর একটু বিস্তারিত ভাবে বলা যাক। অনেকে মনে করতে পারেন স্ত্রীজাতির অলঙ্কার-সজ্জার সবটুকু দায়িত্ব বুঝি তাঁদের একারই। ঠিক তা নয়। এ ব্যাপারে পুরুষের দায়িত্বও বড় কম নয়। মনে হয়, স্ত্রীজাতির অতিরিক্ত গহনা-সজ্জার পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের নীরব সমর্থন এবং প্রকাশ্য বাধাহীনতা আছে। পুরুষের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন ব্যতিরেকে স্ত্রীজাতি এমন নিরঙ্কুশভাবে সজ্জাবিলাসিনী হয়ে উঠতে পারত কি না সন্দেহ।

নারীর আভরণবাহুল্যে পুরুষের ধনাভিমান তৃপ্ত হয়। প্রদর্শন-প্রিয়তা মানুষের বদ্ধমূল রোগ। অপর দশজনের থেকে নিজের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র হলে মানুষ তাকে জাহির না করে থাকতে পারে না। বিশেষতঃ ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা অতি প্রকট। তাই ঐশ্বর্যের অভিমান নিয়ে প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, বন্ধুতে বন্ধুতে প্রচ্ছন্ন আড়াআড়ি।

কতকগুলি স্বীকৃত উপায়ের মাধ্যমে সাধারণতঃ এই প্রতি-যোগিতা আত্মপ্রকাশ করে। যথা, ব্যক্তিগত সজ্জার পারিপাট্য, আসবাবপত্রের আড়ম্বর, প্রচারঢক্কানিনাদিত প্রকাশ্য দান, বাড়ী-গাড়ীর সমারোহ, সর্বোপরি স্ত্রীর গহনা। আর কোন ভালো উপায় হাতের কাছে না পেলে পুরুষ শেষোক্ত উপায়ের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। নারীর অলঙ্কার পুরুষের ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি মোক্ষম অস্ত্র। সুন্দরী নারী যেমন পুরুষের সম্পত্তিবোধকে তৃপ্ত করে তেমনি নারীর গহনার আতিশয্যও পুরুষের অধিকারচেতনাকে সুড়সুড়ি দেয়। নারী জেনে এবং না জেনে পুরুষের এই ষড়যন্ত্রে সহায়তা করে। যখন জেনে করে তখন তার আত্মমর্যাদাবোধ শিকায় চড়ানো থাকে; যখন না জেনে করে তখন সে নির্বোধ। স্ত্রী ভাবে স্বামীকে

দিয়ে গহনার দাবি মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে তার অহঙ্কৃত জয়গৌরব নিহিত, কিন্তু স্ত্রীর দাবির নিকট নতি স্বীকারের একটা ঠাট খাড়া রেখে চতুর স্বামী যে আসলে স্বকীয় অভিপ্রায় চরিতার্থ করবারই পথ প্রশস্ত করে সে খেয়াল কি অলঙ্কারগতপ্রাণ স্ত্রীর আছে? নারীর আব্রুর পান থেকে চুন খসলে যে সমাজে সুনীতির মহাভারত অশুদ্ধ হয় সে সমাজে নারীকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই—এ এক তাজ্জব ব্যাপার বটে।

অথবা জগতের এমনি নিয়ম। ব্যক্তিগত জীবনে যিনি যতই বিবেকী হোন না কেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ তথাকথিত পবিত্র আদর্শের খুরে মাথা না মুড়িয়ে কারও নিস্তার নেই।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে অলঙ্কার মাত্রই অহঙ্কারের পরিপোষক। এবং যে পরিমাণে তা অহঙ্কার সেই পরিমাণে তা শৃঙ্খল। সোনার শিকল কথাটা বোধ করি গহনার বেলাতেই সব চাইতে বেশি খাটে। অলঙ্কারের অলং এবং অহঙ্কারের অহং-এর মধ্যে ধ্বনিগত মিল ছাড়াও বোধ করি গূঢ়তর যোগ আছে। যেখানেই অলং-করণের লোভ সেখানেই ছদ্মবেশে অহং এসে উপস্থিত হয়। আর অহংকে প্রশ্রয় দিতে শাস্ত্রকাররা যে বার বার অলম্ অর্থাৎ নিষেধাত্মক শব্দ প্রয়োগ করেছেন এ কথা কে না জানে।

শব্দের চাতুরী থাক্। বিষয়টিকে আরও একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখা যেতে পারে। আর কোন কারণে না হোক, নিছক মানবতার দিক থেকেই নারীর আতিশয্যলাঞ্ছিত অলঙ্কার-সজ্জা বিসদৃশ। সহস্র সহস্র মানুষ যে সমাজে দুটি পয়সার অভাবে শরীরের উপর ভালো করে এক ফালি 'ত্যানা'-ও জড়াতে পারে না সে সমাজের দুটি-চারটি ভাগ্যবতী প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য আছে

বললেই গায়ের উপর পর্বতপ্রমাণ অলঙ্কার স্তূপীকৃত করবে—এর চাইতে মর্মান্তিক হৃদয়হীনতা আর কী হতে পারে। ব্যাপারটি শুধু দৃষ্টি-কটু নয়, রীতিমতো অশ্লীল। এর মধ্যে এমন একটা 'ক্রিমিনালিটি' আছে যা ক্ষমার অযোগ্য। পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও যে কথাটা বলব তা হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ আত্যন্তিক অলঙ্কার-সজ্জায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, দ্বিতীয়তঃ তা অপরকে অহেতুক আঘাত করে মাত্র। 'আমার আছে' এ কথাটাকেও ছাপিয়ে 'তোমার নাই' এই কথাটাই যেন অলঙ্করণের মধ্য দিয়ে বার বার সদম্ভে ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে।

যদি বলেন এটি গাত্রদাহপ্রসূত মন্তব্য ; তার উত্তরে বলব, লেখকের রুক্ষ গাত্র স্পষ্টতঃই অলঙ্কারের দ্বারা চর্চিত হবার জন্য নির্মিত হয় নি। তবে হ্যাঁ, দগ্ধভাগ্য বাংলা দেশের ততোধিক দগ্ধভাগ্য লেখক, লেখকের ঘরণীর নিরাভরণ হাত দুটি লক্ষ করে লেখক এ কথা বলতে পারেন বটে। কিন্তু কথাটা কি সকল ভাগ্যহীনাকে লক্ষ করেই বলা যায় না? আর কেনই বা ঈর্ষা। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার তো এইটেই নিয়ম। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যে বৈষম্য সকলে মেনে নিয়েছে সে বৈষম্য-নীতি আলোচনা করলে গাত্রদাহ প্রকাশ পায় না, অগণিত লাঞ্ছিত নিপীড়িতের অনুকূলে বেদনাই শুধু প্রকাশ পায়। বিত্তবানদের ভাগ্যে ঈর্ষা করি না, শুধু তাঁদের দরবারে মানবতার দাবি পেশ করতে চাই এইমাত্র স্পর্ধা। শরীরের উপর বিরাশি-সিক্কা ওজনের ভারী ভারী তথা রকমারি গহনা চাপিয়েও যাঁদের গায়ে ব্যথা হয় না, অপরের দুঃখে তাঁদের চিত্ত একটু ব্যথিত হলেই আমরা সন্তুষ্ট। গাত্রদাহ আমাদের নয়, পাছে অলঙ্কারের চাপে ভাগ্যবতীদের গাত্রদাহ হয় সেই আমাদের ভাবনা। জলজ্বলে সোনার গহনার তাপে যদি অঙ্গ না জ্বলে তো কিসে জ্বলবে?

অনেকে সৌন্দর্যের দোহাই দিয়ে আড়ম্বরের পোষকতা করেন।

ভাবখানা এই যে, অর্থ ও বিত্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত না হলে কি নারী দেহকে আশ্রয় করে সৌন্দর্যের উজ্জ্বল প্রভাময় দ্যুতি বিকীরিত হতে পারত? সাজাহান প্রজাশোষণে অতি সুদক্ষ সম্রাট ছিলেন বলেই না মমতাজের প্রেমের স্মৃতির উদ্দেশে নয়নবিমোহন তাজমহল উৎসর্গ করে যেতে পেরেছিলেন! বহু মানুষের বেদনার বুনিয়াদের উপর তাজমহলের উন্নতশীর্ষ তাজ বিলম্বিত।

স্পষ্টতঃই এ জাতীয় সৌন্দর্যচর্চা অন্যায়ভিত্তিক। সৌন্দর্যের চর্চা তখনই সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন সকলেরই জীবনে সৌন্দর্যচর্চার সুযোগ সমান অবারিত এবং তার মাত্রা পরিমিত হবে। পরিমিতি বোধের অভাবে সৌন্দর্য সহজেই মলিন হয়ে পড়ে। মৃণাল হস্তের নিটোল সৌন্দর্য পরিস্ফুটনের পক্ষে যেখানে দু'গাছি চুড়ি যথেষ্ট, সেক্ষেত্রে চুড়িতে চুড়িতে সুগোল-কমনীয় গৌর হস্তকে আবৃত করায় রুচির মালিন্যই শুধু প্রকাশ পায়। আত্যন্তিক অলঙ্কার-সমারোহের দ্বারা দেহকে নয়নমনোহর করে তুলতে যারা চায় তারা অপরের চোখের হিসাবই শুধু করে, স্বীয় অন্ধতা বিচার করে না। অলঙ্কারের ভিতর মূল্যবান ধাতুর সারভাগ যত বেশী, অনুভূতির তত বেশী অসাড়তা। তাছাড়া এ জাতীয় সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যচর্চার নামে অসৌন্দর্যেরই পোষকতা করে মাত্র। বহু মানুষকে অসুন্দর রেখে নিজে সুন্দর হতে যাওয়ার মতো অসুন্দর ব্যাপার আর কী হতে পারে!

তবে কি মেয়েরা গহনা সিন্দুকে পুরে রাখবে? না, তা-ও নয়। সিন্দুকের হা সিন্ধুঘোটকের হা-এর মতোই আকর্ণবিস্তৃত। ওর উদরে যা-কিছু প্রবেশ করানো যায় তা-ই সে নির্বিবাদে উদরস্থ করে। সিন্দুকের স্ফীত উদর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদর্শের অন্তর্নিহিত লোভের স্ফীতিটাকেই লোকচক্ষে প্রকট করে তোলে মাত্র। ওই আপদ সমাজ-সংসার থেকে

যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। যে সমাজে সিন্দুক নেই সে সমাজে লোভও নেই। সিন্দুকের সৃষ্টি হয়েছে অসাম্য থেকে। অসাম্যের অভিশাপ সমাজদেহ থেকে দূর করতে হলে সিন্দুক নামধেয় বস্তুটিকে অগৌণে সিন্ধুর অতল জলে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা উচিত।

শুনি গহনা নাকি মেয়েদের দুর্দিনের অবলম্বন। সুদিনের যা আভরণ তা-ই দুর্দিনের আবরণ হয়ে দাঁড়ায়। বিপদের গহন অন্ধকার ঢাকতে গহনার জুড়ি বস্তু নাকি নেই। হয়তো হবে। তবে ইচ্ছা করলেই কথাটাকে 'চ্যালেঞ্জ' করা যায়। এ ক্ষুদ্র লেখকের বিবেচনায় 'সুদিন' 'দুর্দিন' কথা দু'টির লৌকিক অর্থের কিঞ্চিৎ রদবদল হওয়া উচিত। যে সমাজ-ব্যবস্থা অন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সমাজ-ব্যবস্থাধীনে ব্যক্তি-মানুষের জীবনে দু' দিন পরে পরে দুর্দিন আসবে না তো কী। ইউরোপের যুদ্ধমধ্য বৎসরগুলিকে যেমন আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতিকাল ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, তেমনি পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় সুদিন দুর্দিনের মহড়া মাত্র। সুদিনের আমোদের স্রোতে আমরা যে দু'টি দিনের জন্যে গা ভাসাই সে শুধু কিছুকাল বাদেই দুর্দিনের আবর্তে উন্মথিত হবার জন্যে। সুদিনের জেল্লার ক্ষণবুদ্বুদ ফাটলেই চারিদিকে দুর্দিনের অন্ধকার শূন্যতা। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জীবনে দু দিন বাদে বাদে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। কেননা প্রতিটি অসাম্যের মধ্যেই বিপর্যয়ের বীজ নিহিত। যেখানে পদে পদে অসাম্য ও অবিচার এবং তাকে দেখেও না দেখার ভান, সেখানে বিপর্যয়ের কথা ভেবে এত হাত-পা ছোড়াছুড়ি কেন। আর তার জন্য অগ্রপ্রস্তুতিরই বা এত আধিক্য কেন। বরং তেমন সমাজ-ব্যবস্থার জন্যই আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত, যেখানে সুদিনের উজ্জ্বলতাকে মলিন করবার জন্যে দু দিন বাদে বাদেই দুর্দিনের ভ্রূকুটিকুটিল শাসানি নেই।

দুর্দিনের জন্যে গয়না জমিয়ে কী হবে, অনুচিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ দূর হলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।

অতএব যে দিক থেকেই বিষয়টির বিচার হোক না কেন, শ্রীভেমিয়া অন্ধ্র বিধান পরিষদে অতিরিক্ত গহনা পরার লোভের উপর কর ধার্যের প্রস্তাব করে অসঙ্গত কিছু করেন নি। অসম সমাজ-ব্যবস্থার উচ্ছেদকল্পে হিংসাশ্রয়ী বৈপ্লবিক নীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না, এদিকে অসাম্য-কেও বরদাস্ত করা চলে না। এমতাবস্থায় সুদৃঢ় হস্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপরিমিত লোভ দমনের অধিকার রাষ্ট্রের উপর আশু অর্পণ করাই তো উচিত। উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর ন্যায়সঙ্গত কর ধার্যের দ্বারা যদি মানুষে মানুষে দুস্তর বৈষম্য কিছু পরিমাণেও দূর করা সম্ভব হয়, তেমন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তির সার্থকতা বোঝা যায় না।

জীবনপ্রীতি

জ্ঞানীরা বলেন বেঁচে থাকার একটা নিজস্ব সুখ আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'জয় অব লিভিং'।

পণ্ডিতদের কথা জ্ঞানীগুণীদের কথা পুথিতেই শোনায় ভালো, প্রায়ই সে সব বাস্তব অভিজ্ঞতার ধোপে টেকে না। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে অন্ততঃ তাঁরা মিথ্যাব কারবার করেন নি। লোককে ধোঁকা দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে একটি মোক্ষম সত্য কথা বলে ফেলেছেন। বাস্তবিক বেঁচে থাকবার একটা নিজস্ব বিশিষ্ট সুখ আছে। প্রাণধারণের জন্য আলো হাওয়া অপরিহার্য, সেই আলো হাওয়াই এমন একটা অদ্ভুত দৈব আশীর্বাদ যে মনে আনন্দসঞ্চারেব জন্য আব কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না, জীবন-উপভোগের জন্য বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে এবং চোখ ভরে আলো পান করতে পারাটাই যথেষ্ট।

দয়া করে আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমি জানি, কাঁকরকণ্টকিত র‍্যাশনের চাল আর ভুষিমিশ্রিত র‍্যাশনের আটা খেয়ে জীবধারণের দাঁত-মুখ-খিঁচোনো চেষ্টায় রত কোন ব্যক্তির পক্ষে এমন আপাত-অবিশ্বাস্য কথা উচ্চারণ শোভা পায় না। এটাও স্বীকার করি, আমাদের সদাশয় কংগ্রেস গবর্নমেণ্টের সর্বব্যাপী কুশাসনের আমলে জীবনের জয়গান করায় যথেষ্ট বুকের পাটা দরকার। তবু এই দ্বিবিধ অপবাদের ঝুঁকি নিয়েই বলছি, বেঁচে থাকার একটা অন্যনিরপেক্ষ বিশিষ্ট স্বাদ আছে। এই স্বাদ সব সময়েই যে আমরা পাই তা নয়, তবে কখনও কখনও না চাইতেই

সে আপনি এসে ধরা দেয়। কোন কোন দুর্লভ মুহূর্তে মানুষের মন অকারণ পুলকে ভরে ওঠে, বুঝতে হবে জীবনধারণের স্বয়ংনির্ভর আনন্দের উৎস থেকেই সেই অহেতুক পুলকের উৎসার।

মন্তব্যটি যে কথার কথা নয়, তা আপনারা সকলেই নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরখ করে দেখলেই পারেন। কোনও এক অলস বৈকালেই পড়ন্ত আলোয় দোতলার বারান্দা থেকে রাজপথের জনপ্রবাহ লক্ষ করতে করতে পরম-বিস্ময় ও আনন্দের চমক নিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এ কথা কি কোন দিন বারেকের জন্যও আপনার মনে খেলে যায় নি যে ঐ যারা নীচে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে তারা সকলেই আপনার অতি নিকট আত্মীয়জন, কোন এক অদৃশ্য বন্ধনে আপনার জীবনের সঙ্গে তাদের জীবন বাঁধা? কিংবা শীতের সকালের উষ্ণ মধুর খুসি-খুসি আলোয় একা নির্জন পথ দিয়ে হাঁটছেন, রাস্তার পাশের ঘাসঝোপের ভিতর চোখে পড়ল নীল-বেগুনিতে মেশানো কট-কটে রঙের ফুলভার-শোভিত বিরল একটি মোরগ-ফুলের গাছ, সেই রৌদ্রালোকিত গাছ আর ফুল আর ফুলের রঙ দেখে কখনও কি আপনি এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে যান নি? থেকে থেকে রোমাঞ্চের শিহরণ দেওয়া দেহমনের ভিতর তখন কি এই বোধ জাগ্রত হয় নি যে, মিথ্যা সংসার, পরিবার মিথ্যা, মিথ্যা এই অন্নবস্ত্র বাসস্থান সংস্থানের প্রাণান্তকর ক্লেশ, শুধু আমি যে বেঁচে আছি উন্মুক্ত আকাশের ছড়ানো রোদের তলায়, আলো-হাওয়ার আদর গায়ে মেখে এই মুহূর্তে আমি যে থেকে থেকে শিহরিত হয়ে উঠছি—এই বোধটাই একমাত্র সত্য? জগৎ-সংসারে আমার অস্তিত্বটাই একমাত্র বাস্তব, আর সব অবাস্তব। অবাস্তব কাঁকর মিশোনো চাল আর ভেজাল-ভিজোনো তেল আর জলজলে দুধ, অবাস্তব জনগণের বেকারী, অনশন

আর ভুখ্‌মিছিল, অবাস্তব দুর্মূল্যতা, গৃহসঙ্কট, আর উদ্বাস্তু সমস্যা, এমন কি সবজান্তা জহরলাল আর হামবড়া বিধান আরও অবাস্তব।

কিংবা আরও-একটি অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারেন। গভীর রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের ভিতর যখন সমস্ত জগৎ-সংসার গাঢ় ঘুমে লীন হয়ে আছে সেই সময় আপনার গৃহসংলগ্ন ছাদে তারাভরা আকাশের নীচে নিশ্চয় কখনও না কখনও এসে দাঁড়িয়েছেন। সকলের অগোচরে নিছক নিজেকে চরাচরব্যাপী নৈঃশব্দেব কোলে সমর্পণের মধ্যে একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে, সেই মাদকতা নিশ্চয় আপনার অভিজ্ঞতাকেও ছুঁয়ে গেছে। উর্ধস্থিত নক্ষত্র রোমাঞ্চিত সুবিশাল শূণ্যতার দিকে ধ্যানমৌন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী আপনার মনে হয়েছে? মনে হয়নি কি যে ভালবাসা এবং ভালো বাসবার জন্য বেঁচে থাকাতেই ত জীবনের একমাত্র সার্থকতা? এই ভেবে কি তখন আপনি বিস্ময় বোধ করেন নি যে, কেন মানুষ পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে, ক্ষমতা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার তাড়নার বশে নিজেকে অযথা ক্ষত-বিক্ষত করে, যখন সকল রকমের বিকাব আব অস্বাস্থ্যের ফলপ্রদ প্রতিষেধক মানুষের হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে? যে মানুষ জীবনে ভালবাসতে পেরেছে তার কি আর কিছু চাইবার থাকতে পারে? না, চাইবাব কথা তার মনে হয়?

সব চেয়ে সহজ অথচ সব চাইতে কঠিন এই ভালোবাসবার ক্ষমতা। সহজ এই কারণে যে ভালোবাসবার ক্ষমতা আমাদের প্রকৃতিতে সহজাত; কঠিন: যেহেতু সেই সহজ সাধনার পথ আমরা প্রায়শঃ বিস্মৃত, আজীবন আত্মোন্নতির নামে স্বার্থচর্চা করতে করতে আমাদের স্বভাবেব বিকৃতি ঘটেছে; আমাদের আদিম প্রকৃতির স্বর্গ থেকে আমরা বিচ্যুত।

এই যে পরমপ্রার্থিত ভালোবাসা তার নানা রূপ। কখনও তা ব্যক্তিসাক্ষিক, কখনও সামাজিক; কখনও দেহের সীমানায় আবদ্ধ, কখনও অতীন্দ্রিয়। কিন্তু যে রূপেই তাকে আমরা ভজনা করি না কেন, জীবনকে মাধুর্য আর তাৎপর্যময় করে তুলতে তার জুড়ি নেই। কখনও ভালোবাসা মনোমত নারীতে সমর্পিত, কখনও বিমূর্ত মানব-প্রেম শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন। দুইয়েতেই সার্থকতার চেতনায় জীবন কানায় কানায় ভরে উঠতে বাধ্য। অন্যদিকে, নারীর রূপসৌন্দর্য আর প্রকৃতির বিচিত্র শোভা অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন সুগভীর আনন্দের প্রতিশ্রুতি, তেমনি শুধুমাত্র মনের অতলে তলিয়ে কাউকে বা কিছুকে একান্তভাবে চাওয়ার যে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ পরম আকূতি তার মাধুর্যও অসীম। বিদেহী প্রেম কবিকল্পনা মাত্র নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেম সূক্ষ্ম অনুভূতির বকযন্ত্রে পরিশ্রুত হতে হতে কখন এক সময় যে অতীন্দ্রিয় প্রেম হয়ে ওঠে তা আমরা নিজেরাই টের পাই নে।

তিনটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। তার ভিতর প্রথম অভিজ্ঞতাটি স্মরণ করুন। হাতে যখন বিশেষ কোন কাজ না থাকে, বিশ্রামসুখ থেকে থেকে চিল্‌কিয়ে উঠে মনের পালে খুসির হাওয়া দেয়, সেই সময় প্রবহমান জনস্রোতের গতি লক্ষ করতে কার না ভালো লাগে? নিতান্ত অনাবশ্যক এই চেয়ে থাকা, হয়তো চেয়ে থাকার জন্যই চেয়ে থাকার অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য নেই এই মনোযোগের পিছনে; তবু তাতেই কত আনন্দ! কেন এমন হয়? মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তা বোধের জন্যই নয় কি? মানুষের বৈচিত্র্যমুখিনতাও অনেকাংশে এই আনন্দচেতনার খোরাক জোটাচ্ছে। বিচিত্র মানুষ দেখতে আমরা ভালোবাসি। আমার চেহারা ও স্বভাবের প্রতিরূপ

অন্য আর-এক জন মানুষের ভিতর দেখতে পেলে আমরা খুসি হই বটে, কিন্তু মন তাতে সম্পূর্ণ ভরে না। পক্ষান্তরে, বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে একঘেয়েমি থেকে, পুনরাবৃত্তি থেকে, অভ্যাসের বন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ। আর সেই কারণেই বৈচিত্র্য এত মনোগ্রাহী।

জীবনপ্রীতি মানুষের মনে ঔদার্য আর সহনশীলতার সঞ্চার করে। মানুষকে বোঝার পক্ষে এটি বিশেষ দরকার। জীবন-বিদ্বেষী হয়ে কেউ কখনও মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে বলে জানি না। জীবনপ্রীতি সেই ক্ষমতার কারক যে ক্ষমতার বলে মানুষ মানুষকে তার শত দোষ সত্ত্বেও ভালবাসতে পারে। লোকের কেবলমাত্র গুণ গ্রহণ করব এবং তার দোষত্রুটী দেখেও দেখব না এই সদিচ্ছা একমাত্র তার মনের মধ্যেই জাগ্রত হওয়া সম্ভব—যে নিছক বেঁচে থাকার সুখে আত্মহারা। মানব-বিদ্বেষ, নৈরাশ্যবাদ আর অবিশ্বাসকে যাঁরা জীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরা বুদ্ধির জগতে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন, তা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত, যেহেতু জীবনপ্রীতি এবং জীবনপ্রীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মানবপ্রেম তাঁদের অনায়ত্ত। জীবনের বৈচিত্র্যে তদ্‌গত-চিত্ত এবং মানবপ্রেমী না হয়ে কেউ কখনও স্বকীয় বা পরকীয় জীবনে শান্তি আনতে পারে না।

মুখ

মানুষের মুখ এক আশ্চর্য বস্তু। বিধাতার সৃষ্টিতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কমনীয়, যা কিছু মধুব, তাই ছন্দোময় ও সুমিতি-যুক্ত। এই মহামূল্য ছন্দ ও সুমিতি মানুষের মুখে যেমন উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত এমন বোধ করি আর কোন বস্তুতেই নয়। মানুষের নাক চোখ মুখ কপাল ইত্যাদির গড়ন আলাদা আলাদাভাবে বিচার করলে তার ভিতর যেমন একাধিক বৈশিষ্ট্য-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে, তেমনি হয়তো চেষ্টা করলে তার ভিতর অদ্ভুত আর মামুলির সংমিশ্রণ আবিষ্কার করাও এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু তাতে কি মুখের সৌন্দর্যের কিছুমাত্র হানি হয়? হয় না। হয় না, তার কারণ মুখের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্নতঃ যে আকার ও আয়তনবিশিষ্টই হোক না কেন, সব জড়িয়ে মুখের ডৌল অপূর্ব শ্রীছাঁদযুক্ত হয়েই দেখা দেয়। এই শ্রী ও সুষমা কি নারীর মুখ কি পুরুষের মুখ উভয়তঃ পরিলক্ষনীয়। নারী সহজাতভাবে সুন্দর, তাই বলে পুরুষের সৌন্দর্যও কম মনোহারী নয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্যের যে ভেদ তা হচ্ছে কমনীয়তার তারতম্যের ভেদ; নইলে স্ত্রী-পুরুষের মুখের সৌন্দর্যের ভিতর মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। আসলে মৌখিক সৌন্দর্যমাত্রই সমন্বয়নির্ভর। মুখের বিভিন্ন অংশের ভিতর সুসমঞ্জস ঐক্যে এই সৌন্দর্যের স্ফূর্তি। যে সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি হল সামঞ্জস্য, ছন্দ ও পরিমিতি, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের ভেদজনিত সৌন্দর্যের তারতম্য স্বতঃই খুব বড় একটা পার্থক্য সূচিত করে না। নারীর মুখ হোক পুরুষের মুখ হোক, সৌন্দর্যের মূল্যায়নে শেষ

পর্যন্ত মুখই হল মুখ্য বিচার্য বিষয়। পাঁচ মুখে বর্ণনা করেও মুখের সৌন্দর্যের বর্ণনা শেষ করা যায় না।

মানুষের মুখ দেখতে আমি বড় ভালোবাসি। নির্জনতায় অল্পতেই আমার মন হাঁপিয়ে ওঠে, জনারণ্যের ভিতর এলে তবে দিশেহারা সংসারের অরণ্যে পথ খুঁজে পাই। প্রবীণ নবীন, কমনীয় কঠোর, সুন্দর এবং তথাকথিত অসুন্দর যে রকম মুখই হোক, মানুষের মুখের ভিতর এমন একটা আত্মীয়তার প্রতিশ্রুতি ও প্রাণশক্তির দ্যুতি আছে যে, মন তার প্রভাব-পরিধির মধ্যে এলে অচিরাৎ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মানুষের মুখ থেকে দিব্য বিভা বিচ্ছুরিত হয় কিনা জানি না, তবে অনেক মুখ পরস্পরসন্নিহিত হলে একের মুখের আলো অপরের উপর ঠিকরে পড়ে সে কথা নিশ্চিত। আসলে মানুষ মাত্রই আমার অতি প্রিয়জন, আর আমার এই ব্যাপক মানবপ্রীতির উৎস হল মানুষের মুখ। যে মানুষকে কখনও জানি না চিনি না তেমন মানুষও দু দণ্ডে পরম আপনার লোক হয়ে উঠতে পারে শুধু মুখের মধ্যস্থতায়। মৌখিক আত্মীয়তার মতো আন্তরিক বস্তু বুঝি আর কিছু হতে পারে না।

অনেকে আত্মসমাহিতি, স্তব্ধতা ও নিভৃতির বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁদের বলবার কথা এই যে, আত্মজ্ঞানের পক্ষে নির্জন একাচারিত্বই সব চাইতে প্রশস্ত। পরিপূর্ণ নিভৃতি ও নৈস্তব্ধ্যের আবহাওয়ায় নিজের মনের মুখোমুখি হয়ে বসতে পারলে তবেই নাকি নিজেকে নিজের মধ্যে একান্তভাবে পাওয়া যায়। এঁদের কথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। এ জাতীয় নিভৃতিনিষ্ঠ, একাচারী ব্যক্তিদের জীবন-পরিকল্পনার ভিতর শুধু স্বীয় মুখের হিসাবটাই নেওয়া আছে, পরের মুখের হিসাব নেওয়া হয় নি। আত্মজ্ঞানের পক্ষে আত্মনিবিষ্ট হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, পরের মুখের আয়নায় নিজেকে চিনতে না পারা পর্যন্ত আত্মজ্ঞানের পাঠ

সম্পূর্ণ হয় কিনা সন্দেহ। পরের মুখের সূত্রে যা কিছু পাওয়া যায় তা-ই দুষ্য নয়। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যাস খারাপ, তা বলে পরের মুখের আলোয় নিজেকে চেনার প্রক্রিয়াকে অনাবশ্যক জ্ঞান করা চলে না।

নির্জনতা ও নিভৃতি ভালো জিনিস, তা বলে তা নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বিশেষ ভালো নয়। সংসারে এমন কিছু কিছু বস্তু আছে যা সীমাবদ্ধ পরিসরের ভিতর মুক্তির বার্তাবাহক, কিন্তু তাকেই যদি আবার অসম্ভবের সীমায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় তা কারাগার-সদৃশ পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। নির্জনতা এমনিতরো এক বস্তু। স্বল্পমাত্রা হলে ওটি স্বেচ্ছাবৃত হওয়ার যোগ্য, ভূরিপরিমাণ হলে শ্বাসরোধকারী বন্দিদশার দ্যোতক। অনিয়ন্ত্রিত নির্জনতার বন্দিত্বে আবদ্ধ মনের অবস্থা অনেকটা উদ্দাম পক্ষসঞ্চালনকারী, মুক্তিপাগল পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের মতো। আকাশের উন্মুক্ত বিস্তৃতিতে যদৃচ্ছা ভেসে বেড়াবার স্বাধীনতা পেলে মুক্তি-উন্মুখ বিহঙ্গম আর কিছু চায় না। তেমনি, নিভৃতির বাধ্যতামূলক বন্ধনদশায় মন যখন একান্ত ক্লান্ত হয়ে ওঠে, জনসান্নিধ্য লাভের লোভ মানুষের ভিতর স্বতঃই দুর্নিবার হয়ে ওঠে। একঘেয়েমির পীড়ন থেকে মনকে মুক্ত করতে হলে জনতার সংস্পর্শ অনুশীলন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এক দঙ্গল মানুষের ভিড়ের ভিতর নিজেকে একবার ছেড়ে দিতে পারলে কখন যে খুশির আলোয় মন থেকে-থেকে চিলকিয়ে উঠতে শুরু করে তার হদিস পাওয়া যায় না। জনসান্নিধ্য বিশল্যকরণী লতার মতো, নিঃসঙ্গ জীবনের দগ্ধ ও সন্তপ্ত ক্ষতের উপর তার একটু প্রলেপ পড়েছে কি দেখতে দেখতে তাপিত প্রাণ সরস হয়ে ওঠে। ডাক্তাররা যে প্রায়ই নির্জনতার কোটরে স্বেচ্ছাবন্দী রোগীকে মানুষের সঙ্গে মিলবার-মিশবার পরামর্শ দেন তার ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই। আত্যন্তিক একাচারিতা ও নিঃসঙ্গতা মনের সমস্ত

বৃত্তিগুলিকে বিশীর্ণ-বিশুষ্ক করে তোলে ; মনকে অকারণ ক্ষুব্ধ, চিন্তাক্লিষ্ট এবং অকারণ সংগ্রামমুখী করে তুলতেও নিঃসঙ্গতার তুল্য বস্তু আর নেই। নিজের চারপাশে যখন লোকের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না তখনই কল্পিত শত্রুর আনাগোনা সব চাইতে বেশী বৃদ্ধি পায়। অসহায় জ্ঞানে আপনাকে অহেতুক মমতা করবার অসুস্থ প্রবণতা ও অভ্যাস এই সময়েই বুঝি প্রবলতম হয়ে ওঠে। ইংরেজীতে যাকে self pity বলে তার উৎস অকারণ অসহায়তার বোধে, আর এই অকারণ অসহায়তার চেতনার একটা মোটা অংশই যে আসে স্বেচ্ছাবৃত নিঃসঙ্গতা থেকে তা একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়বে বলে মনে করি।

পক্ষান্তরে, মানুষের সান্নিধ্যে আছে আত্মীয়তার, আত্মপ্রত্যয়ের, আত্মস্থতার সুস্পষ্ট আশ্বাস। মানুষের মুখের ভিতর এমন একটা কিছু আছে যা অচিরেই জনসান্নিধ্যকামী ব্যক্তিকে দশের একজন করে তুলতে সাহায্য করে। মুখের এই বিশেষ গুণকে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা কঠিন, তবু ওটির অস্তিত্ব সম্পর্কে মুহূর্তেকের সন্দেহ করা চলে না। এ কথার বড় প্রমাণ পাই যখন সারাদিন নির্জন গৃহের নিঃসঙ্গ বিবরে ভ্যাপসা গরমে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকার পর পড়ন্ত বিকেলের খুশি-খুশি আলোয় রাজপথের উন্মুক্ত বাতাসে এসে দাঁড়াই, আর অগণিত চলমান মানুষের গতি-প্রবাহের সঙ্গে নিজের চলার বেগটিকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করি। জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মধ্যে এমন একটা উদ্দীপনা আর উল্লাস আছে, চেখে চেখে ভোগ করলেও যা ফুরোতে চায় না। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়ার প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন নেই জনতার যৌথ মূঢ়তাকে মেনে নেওয়ার। অথচ বৃহৎ মানবসমাজের মধ্যে যে মহিমান্বিত মানবাত্মা অন্তর্গূঢ় ভাবে বিদ্যমান, তার সঙ্গে একীভূত হওয়ার আনন্দ এর দ্বারা বুঝি পুরোপুরিই মেলে। যা-কিছুতে আত্মকেন্দ্রিকতার শোধন হয় তাহাতেই মুক্তি।

এই কারণে জনস্রোতকে আমি ঠিক গড্ডলিকা-স্রোত মনে করতে পারি নে। ট্রামে-বাসে রাস্তায় পার্কে ময়দানে যে মুখই দেখি তাকেই যেন অশেষ-চেনা, অশেষ-জানা মুখ বলে মনে হয়। জনসান্নিধ্যে এলেই আত্মীয়তার উচ্ছ্বাসে মন কানায় কানায় ভরে ওঠে। বন্ধুসান্নিধ্য থেকে জনসান্নিধ্যের চেহারার এখানেই তফাত। বন্ধুসমাগমে মন হঠাৎ খুশির ঝলকানিতে ঝলমল করে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-খুশির একটা নির্দিষ্ট আকার আছে, আছে তার উপর পূর্ব-অভ্যাস আর পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিচিত স্বাক্ষর। বন্ধুজনদের কাছ থেকে প্রাণের স্পর্শ কতটুকু পাওয়া যাবে এবং বিনিময়ে তাদের কতটুকু দিতে পারা যাবে তার একটা ছক মোটামুটি আগে থেকেই কষা আছে, এর অতিরিক্ত কেউ প্রত্যাশাও করে না, পায়ও না। পক্ষান্তরে, জনসান্নিধ্যের খাত-বাহিত আনন্দের নির্দিষ্ট কোন আকার নেই, তার কোন পূর্ব-ঐতিহ্যও নেই। ফলে, সবটুকু অভিজ্ঞতাই সেখানে অপরিমেয় রোমাঞ্চের আকর হয়ে মনকে বিমল আনন্দে আপ্লুত করে তোলে। শুধু যে জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেই আনন্দ তা-ই নয়; ঈষৎ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে জনস্রোত চেয়ে দেখতেও আনন্দ। চলমান জনতার গতিশীলতার মধ্যে যে অপরিসীম প্রাণচাঞ্চল্যের আবেগ আছে তা বুঝি অজ্ঞাতসারে দর্শককেও নিবিড়ভাবে অভিভূত করে। প্রমাণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার ইতিহাস। কবিকল্পনার অবরুদ্ধ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছিল মুখ্যতঃ এই জনস্রোতের সংস্পর্শে এসেই। প্রভাত বেলার অরুণ আলোক আর আলোকের ঝরণাধারায় স্নাত জনসমারোহ লক্ষ করতে গিয়ে কিসে যে কী হয়ে গেল সে-রহস্য কি এতই অনায়াসভেদ্য? 'জীবনস্মৃতির' পাতায় এ রহস্যের আংশিক উন্মোচন আছে, তবু মনে হয় মানুষের অন্তর্লোকের উপর রৌদ্র আর জনসমারোহের নিগূঢ় প্রভাবের সবটুকু রহস্য কোন কালেই বুঝি মনুষ্যবুদ্ধির গোচর হবে না।

মানুষের মুখের কী আশ্চর্য স্বপ্নলীলা! উৎসবরাত্রির উজ্জ্বল আলোর মালার তলায় উৎসব-অনুষ্ঠানে সমবেত মানুষের মুখ যদি মনোযোগ সহকারে লক্ষ করা যায় দেখা যাবে সে মুখ থেকে কখন আটপৌরে প্রাত্যহিকতার খোলস খসে গেছে। যে মানুষকে কলতলায় গাত্র-মার্জনারত, বাজারে মেছুনীর সঙ্গে মাছের দর নিয়ে বাদানুবাদরত এবং র‍্যাশনের 'কিউ'তে স্থানের অগ্রাধিকার নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে কলহরত দেখি সেই মানুষকেই যখন আবার উৎসব-সভার প্রদীপ্ত আলোর তলায় আনন্দের পংক্তিভোজে সকলের সঙ্গে সমভোগীর আসনে হৃষ্টচিত্তে উপবিষ্ট দেখি, তাকে চিনতে পারি নে। সে মুখের আদলই যেন আলাদা। পরনে পরিচ্ছন্ন-উজ্জ্বল উৎসব-সজ্জা, গায়ে সুগন্ধ, চলন-বলনে অপরিমিত স্ফূর্তি, মুখে কথার তুবড়ি,—আর এ-সবের কেন্দ্রে সব-কিছুর মধ্যমণিরূপে আলো করে আছে একখানি মুখ, যে মুখ বহু যুগের ওপার হতে অপরিচয়ের স্রোতে ভেসে আসতে আসতে এই মুহূর্তে আমার মনের তীরে তার আগমন-বার্তা প্রথম পৌঁছে দিল। এ মুখের অধিকারীকে অনেক দেখেছি, কিন্তু এ মুখ এই প্রথম দেখলাম। প্রাত্যহিক মুখ অতি পরিচয়ের রূঢ় হস্তাবলেপে মলিন ও ক্লিষ্ট; ক্ষণিকের বিদ্যুদ্দীপ্ত আলোয় চকিতে-দেখা-মুখ আকস্মিকতার উদ্ভাসে উদ্ভাসিত বলেই গূঢ় পরিচয়বাহী। তেমন তেমন মুখ আছে যার সম্মুখীন হবামাত্র মনের ভিতর দূরদূরান্তরের স্মৃতি আলোড়িত হয়ে ওঠে।

লোকে বলে মুখ মনের দর্পণ। কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মুখের ভঙ্গী ও ডৌল যদি অপরিবর্তনীয় হত, তার পিঠে যদি অতি-পরিচয়জনিত হেলাফেলার ঘনিষ্ঠতার পারা বরাবরের জন্য সংলগ্ন থাকত তা হলে না-হয় তাকে মনের দর্পণ জ্ঞান করে তার ভিতর মনকে দেখবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যে মুখের প্রতি মুহূর্তে রূপান্তর ঘটছে, প্রতিটি

অবস্থান্তর ও হাওয়াবদলের সঙ্গে সঙ্গে যে মুখের রঙ বদলাচ্ছে তাকে এত সহজেই কি চেনা যায়? আমার তো মনে হয়, একটি মুখ দুই ব্যক্তির নিকট ঠিক এক পরিচয় বহন করে না এবং একই ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় বহন করে। মুখের বৈশিষ্ট্য অথবা বৈশিষ্ট্যহীনতার বোধ দুই-ই নির্ভর করে অবস্থার তারতম্যের উপর। যে মুখকে চিনি বলে আমরা জাঁক করি সে মুখকে সর্বকালে সর্বাবস্থায়ই কি আমরা চিনি?

পোশাক

আমার বিরুদ্ধে আমার বন্ধুবান্ধবদের একটা মস্ত অভিযোগ এই যে, আমি নাকি চেহারার পরিপাট্য বিধানে, সাজ-সজ্জা পোশাক-আশাকের ব্যাপারে তেমন মনোযোগী নই। আর ওইটাই নাকি আমার সাংসারিক অসাফল্যের (যে বিষয়ে আমার বন্ধুবান্ধবদের কেন, আমার নিজের মনেও কোন সংশয় নেই) মূল কারণ। বন্ধুরা তাঁদের অভিযোগের সমর্থনে এই যুক্তি দেখান যে, চেহারার যত্ন নিলে একদিকে যেমন নিজের প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করা হয় তেমনি অপরের প্রতিও সম্ভ্রম দেখানো হয়। সমাজে চলতে গেলে এ দুটোই এক সঙ্গে দরকার। মানুষের গুণপনা কিছু তার গায়ে লেখা থাকে না। মুখেই মনের পরিচয় একথা নীতিবাক্য হিসাবে যতই মনোজ্ঞ হোক, শুধু মুখের আদল দেখে লোকে ভোলে না; মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্যিক প্রকরণাদির আশ্রয় নিতে হয়। সাজসজ্জা এই বাহ্যিক প্রকরণাদির অন্যতম। একজন লোকের সাজসজ্জা থেকে বলে দেওয়া যায়, সে লোক কী বা কেমন। কাজেই সাজসজ্জার ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই অবহেলা করা চলে না। যে লোক করে, বুঝতে হবে তার মনুষ্যচরিত্রের জ্ঞান নেই। সাজসজ্জার ঔদাসীন্যের দ্বারা সে যে শুধু নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তা-ই নয়, অপরের রুচিবোধকেও অহেতুক পীড়িত করে। মানুষ মানুষের এই ত্রুটি বরদাস্ত করতে নারাজ।

বন্ধুবান্ধবদের এই যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সত্যিই

তো, আমার চেহারা আর সাজপোশাকের মধ্য দিয়ে আত্মসম্ভ্রমবোধের পরিচয় যদি প্রকাশ না পায়, লোকেই বা আমাকে সম্ভ্রম দেখাবে কেন। আমি নিজেই যেখানে আমার মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন নই, অপরে সে স্থলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে মার্যাদা দেখাতে যাবে অতটা আশা করা অনুচিত। তাছাড়া আরও কথা আছে। চেহারার অযত্নের মধ্যে সমাজের আর-দশজন মানুষের প্রতি এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পায়, যা নাকি সামাজিক মানুষ ক্ষমা করতে অপারগ। লোকে উৎসব-অনুষ্ঠানে, বিবাহে, ভোজে তাদের সেরা পোশাক পরিধান করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায় কেন। স্বীয় চেহারার সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্যই শুধু নয়, নিমন্ত্রণকারী পক্ষের এবং তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যও বটে। কথায় বলে, 'আপ-রুচি খানা, পর-রুচি পর্না।' পরের রুচি অনুযায়ী সাজ-সজ্জার বিধান পরের প্রতি মর্যাদার দ্যোতক। যার এ চেতনা নেই, যে শুধু আত্মখেয়ালেই সব সময় মগ্ন, সমাজে চলাফেরা করা তার পক্ষে সত্যই একটু অসুবিধাজনক।

তদুপরি, সাজ-সজ্জার পারিপাট্যের সঙ্গে লোকের আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধনীর পোশাক তার ধন-কৌলীন্যের জ্ঞাপক, অন্যপক্ষে দরিদ্রের পোশাক তার দারিদ্র্যের নিশানা। ধনী খেয়ালের বশে আটপৌরে পোশাক পরতে পারে, পরেও থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি গরীব তার পক্ষে একদিন শখ করেও দামী পোশাক পরা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে সে আর গরীব থাকত না, ধনীর কোঠায় প্রোমোশন পেয়ে যেত। এই তত্ত্ব মানুষের জানা আছে বলেই মানুষ আগন্তুক দেখা মাত্র সর্বপ্রথমে তার পোশাকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে, তারপর অন্যদিকে দৃক্‌পাত করে। চেহারায় আর পোশাকে মিলিয়ে আগন্তুকের সামাজিক অবস্থাটা মোটামুটি আঁচ করে নেওয়ার

জন্মই এই প্রয়াস। প্রয়াসটি কখনও সজ্ঞান, কখনও অর্ধজ্ঞান, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্জ্ঞান। বোধ করি অভ্যাসে অভ্যাসে জিনিসটি আমাদের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই এরকম হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Tell me what you like and I shall tell you what you are. তোমার পছন্দ-অপছন্দ আমাকে জানালে আমি বলতে পারি তুমি লোকটি কেমন। এইটিকেই একটু ঘুরিয়ে এইভাবে যদি বলি, Tell me what you wear and I shall tell you what you are, তা হলে অভিপ্রেত অর্থের বোধ করি খুব বেশি বদল হয় না। অন্ততঃ পোশাক দেখে যে মানুষের আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায় সে কথা নিশ্চিত।

চারদিকে শুধু সম্মান আর সম্ভ্রমের জয়জয়কার। বন্ধুবান্ধবদের মুখে 'আত্মসম্মান' কথাটা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কিসের জন্য আত্মসম্মান, কাকে দেখাবার জন্য আত্মসম্মান? যে সমাজে বেশির ভাগ লোক পেট পুরে খেতে পায় না, পরবার বস্ত্র আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই জোটাতে পারে না, আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখবার মতো কোনরকম জীবনোপায়ই যাদের নাগালের ভিতর নেই, সেই সমাজে তোমার-আমার মতো দু'-দশজন ভাগ্যবান লোকের জীবনে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রইল কি ক্ষুণ্ণ হ'ল কী তাতে এসে যায়। সর্বব্যাপী মানবিক দুর্গতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুসংখ্যক লোকের এই যে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা—এ আমার কাছে নিতান্ত অবমাননাকর মনে হয়। এ এক ধরনের চেতনার অসাড়তা ছাড়া আর কী! পোশাকে-আশাকে তথাকথিত ভদ্রত্ব বজায় রেখে চলবার চেষ্টা তথাকথিত ভদ্র শ্রেণীর করণ-কারণের প্রতি নিষ্ঠার জ্ঞাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এই নিষ্ঠা অতিশয়

সঙ্কীর্ণ স্বার্থচেতনাপ্রসূত, সেটি বলা দরকার। এতে বোঝায় এই কথা যে, তোমার দৃষ্টি তোমার স্ব-শ্রেণীর পরিধির ভিতর ঘুরপাক খেতে অভ্যস্ত, অগণিত সাধারণ দুর্গত মানবের বেদনা তোমার চিন্তায় স্থান পায় না। যদি পেত তা হলে তথাকথিত ভদ্র সমাজের কৃত্রিম সম্ভ্রমবোধ আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্য তোমার তরফে এমন কাঙালপনা প্রকাশ পেত না।

বাস্তবিক, আমার পোশাক আরও কেন দীন নয়, আমার আক্ষেপ তাই। আমার পোশাক-আশাকে যে-অনুপাতে আমি 'ভদ্র' সমাজের রীতি-কানুন অনুসরণ করে চলছি, বুঝতে হবে 'ভদ্র' সংস্কারের প্রতি তদনুপাত মোহ আজও আমার ভিতর বিদ্যমান। আমি যে পরিমাণে প্রচলিত সংস্কারের অধীন সে পরিমাণে আমি পরাধীন। শ্রেণিচেতনা এখনও যে আমি বিসর্জন দিতে পারি নি এতে শুধু সে কথারই প্রমাণ হয়। এতে গর্ব করবার কিছু নেই, গ্লানি বোধের কারণ আছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি ভ্রমণকালে তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন কেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, চতুর্থ শ্রেণী নেই বলেই তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও অনুরূপ মনোভাব অবলম্বনীয়। আমি কেন মহামতি গ্ল্যাডষ্টোনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলতে পারি না, এর চাইতে আটপৌরে, দীন বস্ত্র নেই বলেই আমাকে বর্তমান সজ্জায় ভূষিত হয়ে চলতে হয়, থাকলে তা-ই আমি কোন্-না পরিধান করতাম? একেবারে জীর্ণ শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরবার মতো মানসিক মুক্তি অর্জন করতে পারতাম তো বেঁচে যেতাম।

কথাটা ঠাট্টাচ্ছলে নেবেন না। কলকাতার রাস্তায় চলতে চলতে যখন দেখতে পাই, ফুটপাতের উপর কোন ভিখারিণী নারী ছিন্ন

শতভালিযুক্ত মলিন 'ভ্যানার' আবরণে স্বীয় লজ্জা 'পথিকের করুণার উপর' বিনিঃশেষে সমর্পণ করে অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে, আব্রু বাঁচাবার তার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট নেই, যখন দেখতে পাই অনাদৃত-অবজ্ঞাত বে-ওয়ারিশ কোন শিশু শীতের দিনে আদুল গায়ে পথের ধূলায় পড়ে আছে আর দারুণ হিমে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, তখন আমার এই ভদ্র পোশাক স্বীয় গাত্রোপরি একটা বিরাট ব্যঙ্গের মতো মনে হয়। মনে হয়, চারিদিকের এই সর্বব্যাপী রিক্ততার মাঝখানে আমাদের জনকয় মানুষের এই ভদ্র সাজবার প্রাণান্তকর প্রয়াস একটা প্রচণ্ড হ্যাংলামি ভিন্ন কিছু নয়। কিসের ভদ্রত্ব, কিসের কী। কেনই বা আত্মাভিমান। ওই-যে রাস্তার ধূলায় জনকয় আপাত-সক্ষম পূর্ণবয়স্ক বেকার অবসন্ন ভঙ্গিতে চুপচাপ শুয়ে আছে, ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁকে তাদের লিকলিকে সরু পা-গুলি পাঁকাটির মতো ঝুলছে, দীর্ঘদিনের উপবাস-খিন্ন ফোলা পেটের চামড়া ফুঁড়ে শিরাগুলি দড়ির মতো বেরিয়ে আছে, ঘাড়ে গলায় গালে এমন ময়লা জমেছে যে চামড়ার উপর একটা ঘন কালো আস্তরণ পড়ে গেছে, মাথার জটাসদৃশ চুলের জঙ্গলের মধ্যে উকুনের ছড়াছড়ি—এদের এবং এদের সমগোত্র লোকদের যখন দেখতে পাই তখন আমার আত্মসম্ভ্রমের অহংকার আমার গায়ে এসে চাবুকের মতো বেঁধে। এক-এক সময় ক্ষোভ এবং ধিক্কারের সঙ্গে মনে হয়, বৃথা আমাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আত্মোন্নতির প্রয়াস, বৃথা আত্মসম্ভ্রমের ঠেকো দিয়ে নিজেকে সব সময় চাগিয়ে রাখবার চেষ্টা। সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক যে সমাজে আহার্য-বস্ত্র-আশ্রয়বঞ্চিত হয়ে জীবন্মৃতবৎ বেঁচে আছে, সে সমাজে তোমার আমার আত্মোন্নয়ন প্রয়াস একটা প্রচণ্ড বিলাস বই আর কী। শাস্ত্রে মনের গতিকে সর্বদা উর্ধ্বগামী রাখবার কথা বলা হয়েছে, ভুলেও নিম্নগামী প্রবৃত্তিকে

প্রশ্রয় না দেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বহুসংখ্যক মানুষকে অনাদরের ধূলায় পিছনে ফেলে রেখে কিছু সংখ্যক মানুষের ঊর্ধ্বগামিতার প্রয়াস কি মান্য? সুবিধা যদি ভোগ করতে হয় তো সকলকেই সে সুবিধার ভাগ সমভাবে পরিবেশন করতে হবে। তা না পারি তো কারুরই সুবিধা ভোগে দরকার নেই। সকলেই পথের ধূলায় সমভাবে গড়াগড়ি যাক।

বলা হবে, সমাজে দারিদ্র্য অশিক্ষা রোগ শোক বহুব্যাপক, আমরা উপরতলার কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই পর্বতপ্রমাণ দুর্ভাগ্যের নিরাকরণে কতটুকু কী করতে পারি। যে দুঃখ সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত সে দুঃখের মূলচ্ছেদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের; আলাদাভাবে ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় এক্ষেত্রে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

কথাটা স্বীকার্য, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত সহানুভূতি সমবেদনার প্রয়োজন ফুরায় না। একার চেষ্টায় বহুর দুঃখ নিরাকরণ যে সম্ভব নয় এ কথা বিশদ ভাষণের অপেক্ষা রাখে না, তা হলেও বহুর দুঃখে বিগলিত হবার মতো চিত্তবৃত্তি মনের ভিতর সব সময় জাগরূক রাখা আবশ্যক। এতে আর কিছু হোক আর না হোক, আমাদের অপরাধের ভার লাঘব হয়; আমাদের অক্ষমতা আর অসহায়তার চেতনা মনের ভিতর সঞ্চারিত হয়ে আমাদের অন্ততঃ কিছুটা বিনয়ী করে তুলতে সহায়তা করে। কারুণ্যের অনুভূতি মনকে শান্ত রাখে, তাকে কখনও আত্মম্ভরী হতে দেয় না। একার বা কতিপয়ের চেষ্টায় বহুর দুঃখ দূর করতে না পারার বেদনা মনের ভিতর এমন একটা মধুর ব্যর্থতাবোধের সৃষ্টি করে যার সংস্পর্শে মনের সকল ময়লা কেটে যেতে বাধ্য।

এই মধুর ব্যর্থতাবোধ কয়জন আমরা সত্যি মনের ভিতর লালন করি? আমরা যখন বনেদিয়ানার গর্ব করি, আভিজাত্যের জয়ডঙ্কা পিটাই,

'আত্মসম্মান' 'আত্মসম্মান' করে আকাশ বাতাস মথিত করি, তখন সে আচরণের মধ্য দিয়ে এই ভাবটাই কি ফুটে ওঠে না যে, আমাদের দৃষ্টি স্বসমাজের গণ্ডীর ভিতর বড় বেশি আবদ্ধ আমরা আমাদের সামাজিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সুখ দুঃখের কথা সামান্যই চিন্তা করি? পোশাকের পারিপাট্য বিধানের কথা বলা হয়, কিন্তু কার জন্য? আমার এবং আমারই মতো মানসিকতাসম্পন্ন স্বশ্রেণীর অপর কতিপয় মানুষের মনস্তুষ্টির জন্য নয় কি? কাকে আমরা ভোজে আপ্যায়িত করি? আমার মতো যাঁদের আহার বিহারের কষ্ট নেই, তাঁদেরই কি ডেকে এনে তাঁদের ভরা পেট আরও বেশি ভরিয়ে তুলি না? কাকে আমরা বন্ধুর মর্যাদা দিই? যাঁর বন্ধুসংখ্যা অগণন, এবং সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ়, দু-চারজন বন্ধু এল কি গেল এতে যাঁর কিছুই আসে যায় না, তাঁকেই কি আমরা সাধারণতঃ ডেকে বন্ধুত্বের আসনে সমাসীন করি না? আমাদের আভিজাত্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ, বন্ধুত্বস্পৃহা সবই এক-একটা মস্ত প্রহসন। বহুর বেদনার উপর আমাদের সামাজিক কৌলীন্যের সৌধ উত্তুঙ্গ হয়ে আছে। এ সৌধ গুঁড়িয়ে যায় তো কার কী ক্ষতি।

বাস্তবিক আমাদের অপরাধের কোনো তল নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের একটি মানুষও অভুক্ত, অনাবৃত, অনাশ্রয় থাকছে, ততক্ষণ কারুরই আমাদের বহাল তবিয়তে সুখভোগের অধিকার নেই। সমাজে দুঃখের পরিমাণ যত বেশি তত বেশি আমাদের দায়িত্ব। এমন যদি হয় যে, দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষায় অভাবে রোগেশোকে কষ্ট পাচ্ছে, কিছু সংখ্যক লোক মাত্র সমাজের উপরতলায় বসে সুখ ও সুবিধা লুটছে, তবে সেই সুবিধাভোগী কিছুসংখ্যক লোকের প্রত্যেকেই এক-একজন মস্ত পাপাচারী। তারা যে পাপাচারী তার প্রমাণ, সমাজের তাবৎ

সংগতি ও সম্পদ জনকয় ব্যক্তি মিলে একাই তারা ভোগ করতে ব্যস্ত, এই সম্পদের উপর সাধারণ মানুষের যে কিছু দাবি থাকতে পারে এটি তাদের চেতনায় প্রবেশ করে না। যদি-বা করে, প্রবল স্বার্থবোধ সেই বিবেকের তাড়নাকে অনুক্ষণ চাপা দিতে সচেষ্ট। সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি যখন এবংবিধ চেতনার অসাড়তা দেখা দেয়, বুঝতে হবে জাতীয় জীবনের পক্ষে তা ঘোর দুঃসময়। আমাদের দেশে বর্তমানে সেই বিমর্ষ অবস্থাই চলছে।

শৌখীন পোশাক পরে আত্মশোভা বর্ধনের নারীসুলভ প্রয়াস ধিক্কৃত আরও এ কারণে যে, ওতে অহংবোধ প্রকাশ পায়। সেটি অতি নিম্নস্তরের বস্তু। অহংবোধ মাত্রই খারাপ, আত্মাদর মাত্রই অশ্রদ্ধেয়, তার উপর সেটি যদি মনকে আশ্রয় না করে দেহকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে তবে তা আরও নিন্দনীয়। কৃত্রিম উপায়ে নিজের দাম বাড়িয়ে পরের মনোহরণের চেষ্টা মূঢ়তার চরম। বলা হবে, নারীর ভূষণ আর অলঙ্কার-সজ্জার ভিতরের কথাটাও তো এই, তবে সেখানে কেন আমাদের আপত্তি দেখা যায় না। এব উত্তর এই যে, নারীর পক্ষে যা প্রযোজ্য, মানুষমাত্রের পক্ষেই তা প্রযোজ্য নয়। পুষ্প ও ধাতুদ্রব্যনির্মিত আভরণ এবং বর্ণগন্ধের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দেহসৌন্দর্য বৃদ্ধি করে পুরুষের মনোহরণ করাটা নারীর প্রকৃতিগত অভ্যাস। ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা প্রায় নারীত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। নারীকে মেনে নিতে হলে তার এই অভ্যাসটিকেও মেনে নিতে হবে। এর আর চাড়া নেই, কেন না, ফুল পেলে নারী সে ফুল মাথায় গুঁজবেই, গয়না পেলে সে গয়না গায়ে পরবেই, লাল রঙ পেলে হয় সে রঙ ঠোঁটে মাখবে নয়তো আলতা করে পায়ে পরবে, গন্ধদ্রব্য পেলে সেটি শরীরে ঢালবেই। তাই বলে পুরুষেরও

এসব প্রকরণ-পদ্ধতি অনুসরণ করা? ছি ছি, সংসারে নারীপুরুষের কর্মবিভাগ তা হলে আছে কী জন্যে। যদি বলেন, পুরুষ তো সত্যি আর মাথায় ফুল গোঁজে না, পায়ে আলতাও পরে না, গায়ে গয়নাও চাপায় না, তা হলে এত উষ্মা কেন। এর জবাবে বলতে চাই, প্রকরণ-পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করাটাই তো সব নয়, নারীস্বভাবের অন্তর্লীন সজ্জামোহ পুরুষের আচরণে ফুটে উঠছে কিনা সেইটি দেখা দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, স্বীয় কদর বাড়াবার তাগিদে কোন পুরুষকে যখন প্রসাধনরত দেখতে পাই, যখন দেখি, এই দশাসই এক জোয়ান-মদ্দ, গায়ে ফিনফিনে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে তিন-তিনটে আংটি, পাউডারের ছোপে ঘাড় গলা মুখ শ্বেত-শুভ্র, গন্ধে দেহ ভুরভুর, মাথার চুল পরিপাটি বিন্যস্ত, আয়নার সামনে আপনার দেহশোভা নিরীক্ষণ করছে আর আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে সযত্নকর্তিত গোঁফের প্রান্ত চুমড়াচ্ছে—তখন রীতিমতো গা ঘিন ঘিন করে। এর উপর কেউ যদি আবার অপ্রয়োজনের চশমা চোখে পরে আরও বেশি মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করে তা হলে মেজাজ বিগড়ে যেতে বাধ্য।

খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ থাক্। আমি যে কথা দিয়ে নিবন্ধের শুরু করেছিলাম সেটি পুনরায় বিবৃত করি। অপরের নিকট স্বকীয় কদর বাড়াবার জন্য সজ্জার পারিপাট্য বিধানের চেষ্টা আমার মতে অশ্রদ্ধেয়। আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াসের নামে এটি আত্মাবমাননা বই কিছু নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শ সর্বদাই মান্য, তা বলে সাজ-সজ্জার ঘটাপটা করে ছন্নতা প্রকাশের অর্থ হয় না। মানুষের সমাজে এমনিতেই ব্যবধানের অন্ত নেই, তার উপর পোশাকের কৌলীন্য সৃষ্টি করে আর-একটি বড় রকমের ব্যবধান না গড়লেই কি নয়? ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তিদের পক্ষে যেমন আজকের দিনে উপবীত ধারণ করাটা

বেমানান, তেমনি পোশাকের তারতম্যের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াসও এ যুগের প্রবহমান সাম্যাদর্শের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ঋষি টলস্টয় যেদিন বুঝেছিলেন তাঁর আভিজাত্য ঠুন্‌কো, তাঁর বনেদিয়ানার অহঙ্কার প্রবল একটি মোহ মাত্র, সেদিন তিনি তাঁর আভিজাত্যের খোলসটিও সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেদিন জনসাধারণের পোশাকে জনজীবনের স্তরে তিনি নেমে এসেছিলেন। রুশ কৃষকের আচারব্যবহার ধরণধারণ তিনি সজ্ঞান সাধনায় আয়ত্ত করেন। গণজীবনের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের চেষ্টায় সেদিন নোংরা পোশাক পরতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। মহামতি টলস্টয়ের এতাদৃশ আচরণের মূলে এই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল যে, পোশাকের অসমতা বড় রকমের একটি ব্যবধান, এই ব্যবধান মানুষে মানুষে বিরোধ জীইয়ে রাখতেই শুধু সাহায্য করে; পক্ষান্তরে ব্যবধানটি দূর হলে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা স্থাপনের কাজ বহুগুণ সহজ হয়ে যায়।

আমাদের গান্ধীজীর দৃষ্টান্তই ধরুন। তাঁর কটিবাসমাত্রসম্বল পোশাক ভারতের জনসাধারণের পোশাকের প্রতীক। খেয়ালের বশে এ পোশাক তিনি পরেন নি পরন্তু ভারতের গণ-জীবনের সুখ-দুঃখের সত্যিকার শরিক হবার কামনা থেকেই এই পোশাক তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। অন্যান্য ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে সজ্জাগত ব্যবধান দূর করাও তিনি তাঁর নেতৃত্বের সৌকর্যের পক্ষে আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন। আমরা যেদিন সাজসজ্জার ব্যাপারে টলস্টয় আর গান্ধীর মনোভাবের অনুসরণ করতে পারব সেইদিনই শুধু আমরা যথার্থ সম্ভ্রমে ভূষিত হয়ে উঠব, তার আগে যেন আমরা সম্মান সম্ভ্রমের গর্ব না করি।

পর্দা

পর্দা জিনিসটা গৃহশোভার উপকরণরূপে প্রায়শ আজকাল ব্যবহৃত হয়। বিশেষ, সচ্ছল গৃহস্থদের মধ্যে এই রেওয়াজ সমধিক প্রচলিত দেখতে পাই। সম্পন্ন মধ্যশ্রেণীর বাসভবনগুলির মধ্যে এমন বাসভবন অল্পই পাওয়া যাবে যার দরজায় জানালায় পর্দা নেই। সুন্দর-সুদৃশ্য ভারী মোটা কাপড়ের রঙিন পর্দায় গৃহের যে একটা বিশেষ শ্রী আসে তা অতি বড় স্থূলদর্শীও স্বীকার করতে বাধ্য। কোন গৃহস্বামীই তাঁর অধিকৃত গৃহটিকে অপরের মনোমত করে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। আসবাবপত্রের বৈচিত্র্য, সমারোহ ও সৌন্দর্য এই ক্ষেত্রে তাঁর একটি প্রধান সহায়। কিন্তু এ সবই হল আভ্যন্তরীণ সজ্জার প্রশ্ন— গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আগন্তুকের বোঝবার উপায় নেই গৃহটি সযত্ন অথবা অযত্নরক্ষিত। পর্দার সম্বন্ধে সে কথা বলবার জো নেই। ওটি একই কালে গৃহের ভিতরের এবং বাহিরের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। ঘরে বসে দেখ অথবা বাইরে থেকে দেখ, পর্দাসজ্জিত গৃহের রুচির পারিপাট্য চোখে না পড়েই পারে না। পর্দা জিনিসটা যেমন নামে তেমনি কাজে ঢাকবার জন্যই মুখ্যতঃ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু এর মতো স্বপ্রকাশ বস্তু বুঝি দুটি নেই। পর্দায় গৃহ ঢাকা পড়ে না, গৃহের অবগুণ্ঠন আরও উন্মোচিত হয়।

এ পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছি, পর্দার সম্বন্ধে পুরোপুরি সত্য কথা বলা হল কি না। সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে উপরের কথাগুলি সত্য বই কি, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে? পর্দা-প্রথার

ভিতরের কথাটা কি? ওটি কি অহেতুক মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে না? বিষয়টির বিশদ আলোচনার জন্য আসুন একবার পর্দার আড়ালে ভালো করে এক-নজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

পর্দা-প্রথা সমাজ-জীবনে বহু অনর্থের কারক হয়েছে, এ কথা আমরা মানি ও বলি। তা যদি হয়, গৃহের অবরোধ রচনাকারী পর্দার সম্বন্ধেই বা সে কথা বলা যাবে না কেন। গৃহের দরজায় জানালায় বিলম্বিত পর্দা কি পর্দা-প্রথারই একটা রূপান্তরিত ছদ্মবেশ নয়? পর্দায় এক দিকে যেমন গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি অন্য দিকে তার ফলে গৃহের অভ্যন্তরে মুক্ত বায়ুর অবাধ প্রবেশ রুদ্ধ হয়। ওটি মানুষকেও ঠেকিয়ে রাখে, হাওয়াকেও ঠেকিয়ে রাখে। যে সৌন্দর্যচর্চার দ্বারা মানুষকে অনাত্মীয়, স্বাস্থ্যকে দুর্লভ করে তোলা হয়, তেমন সৌন্দর্যসাধনার সম্পর্কে বুঝি উল্লসিত হওয়া চলে না। মানবতা তথা স্বাস্থ্যহীন সৌন্দর্যচর্চার নীতি কোন কালে গ্রাহ্য হয় নি, আজও হবে না।

এই কারণে আমি আমার গৃহের দরজায় জানালায় পর্দা ঝোলাবার নীতির বিরোধী। আমার যাঁরা বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁরা বলেন, আমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি; আর কোন কারণে না হোক, পরিবার-জীবনের শুচিতা এবং গোপনতা রক্ষার জন্যই দশের চক্ষুর দৃষ্টিসীমা থেকে স্বগৃহকে কিঞ্চিৎ আড়াল করবার চেষ্টা করা উচিত। মানুষের সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি মূল কথা হল অপরের অসুবিধা না ঘটিয়ে স্বীয় রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী আপনার মনোমত পথে চলবার বাধাবন্ধহীন অধিকার। অপরের দৃষ্টির অত্যাচারে এই অধিকার যদি কেবলই খণ্ডিত আর পীড়িত হতে থাকে, তা হলে আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রইল কোথায়। যে স্বাধীনতা ও স্বাধিকারনীতির একজন পরম ভক্ত বলে আমি নিজেকে জাহির করে

থাকি, সেই স্বাধীনতা ও স্বাধিকারকে যদি পদে পদে শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'পথিকের করুণার উপর নির্ভর' করতে হয়, সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কি মস্ত ব্যঙ্গে পর্যবসিত হয় না ?

তাছাড়া বন্ধুদের আর একটি যুক্তি, গৃহকে উন্মুক্ত ও অনাবৃত রাখতে আমার না আপত্তি থাকতে পারে, প্রতিবেশী ও পথচারীদের তো সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক। চক্ষু বস্তুটি এক অদ্ভুত পদার্থ। ওটি রত্নও বটে, আবার সমূহ অনর্থের কারকও বটে। এমন বেযাড়া জিনিস আর দুটি নেই। চক্ষুর ধর্ম হচ্ছে, সামনে যা পড়বে তারই উপর তার দৃষ্টি আপতিত হবে, এ বিষয়ে সে অধিকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না (চক্ষুর এই অবাধ্যতার জন্যই সাধক সুরদাস শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছা-অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন)। কাজেই চক্ষুর দৃষ্টিসীমার পথে প্রতিবন্ধক রচনা না করলে সময় সময় চক্ষুর অধিকারীরই অসুবিধা হয়। কাব্যগ্রন্থ হাতে সারা ঘরময় পায়চারি করে তারস্বরে কবিতা আবৃত্তি না করলে আমার কবিতা পড়া হয় না ; কিংবা, এক দঙ্গল শিশু জড় করে তাদেরই একজন হয়ে তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতে আমার প্রচণ্ড উৎসাহ ; কিন্তু এ দুটি দৃশ্য যে আমার প্রতিবেশীরও সমান প্রীতিকর মনে হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়। শিশুদের নিয়ে খেলায় মেতে ওঠায় আমার না সংকোচ হতে পারে, কিন্তু আপাতগম্ভীর পূর্ণবয়স্ক একজন ভারিক্কী মানুষের এই অবিশ্বাস্য বালসুলভ চাপল্যদৃষ্টে প্রতিবেশীর ঘেমে-ওঠা আশ্চর্য নয়। সেই অবাঞ্ছিত এবং অনভিপ্রেত অস্বস্তির হাত থেকে প্রতিবেশীকে রক্ষা করবার জন্য ঘরের জানালায় দরজায় পর্দা খাটানো উচিত। পর্দা হল যবনিকা ; গৃহের চতুঃসীমার অভ্যন্তরকে পর্দার যবনিকা দিয়ে আড়াল না করলে গৃহস্বামীরও অসুবিধা, প্রতি-বেশীরও অসুবিধা।

বন্ধুদের এই শেষোক্ত যুক্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ সারবস্তু আছে অস্বীকার করব না। তবে এ যুক্তিও পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় কি না সন্দেহ। আমাদের সংকোচ-অসংকোচ, শোভনতা-অশোভনতার ধারণাগুলি সবই লৌকিক সংস্কার-প্রসূত। আমাদের অধিকাংশ রীতি ও অভ্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সমাজপ্রচলিত গতানুগতিক সংস্কারের কাছে সেগুলি এক ধরনের কুর্নিশ নিবেদন ছাড়া কিছু নয়। সামাজিক অভ্যাসের বেলায় আমরা প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের মূঢ়তা-গুলির অনুসরণ করি। ঐতিহ্য-অনুমোদিত এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো মূঢ়তারও জোর প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। তখন তাকে ঠেকাতে বা অতিক্রম করতে হলে প্রচণ্ড মনোবলের প্রয়োজন হয়। সমাজের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই তা দুর্লভ।

ঘরে ঘরে পর্দা খাটাবার নীতিটা আসলে গোপনতাপ্রীতি থেকে উদ্ভূত। ওর পিছনে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতার আদর্শে অনুপাত-অতিরিক্ত বিশ্বাস আর নিজের এবং নিজের একান্ত আপনার জনদের সম্পর্কে অনুচিত মোহ। অতিরিক্ত আত্ম ও পরিবারকেন্দ্রিক মন নিজের চারদিকে বেড়ার আড়াল রচনা করতে চায়। পর্দা আসলে এই বেড়ারই স্বগোত্র বস্তু। মাঝখানে এই বেড়ার ব্যবধান না থাকলে আমাদের 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' আশা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। কে বলে আমরা সমাজবদ্ধ জীব? সমাজবদ্ধ জীব হয়েও আমরা অহোরাত্র পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করবার ফিকির খুঁজি। কোথায় আমাদের জীবন পরস্পরের নিকট খোলা বইয়ের মতো হবে, তা নয়, সর্বসাধ্য উপায়ে কেবলই আমরা একে অপরের কাছ থেকে আড়াল খুঁজে বেড়াচ্ছি। ব্যক্তিগত নিভৃতির আদর্শের খুরে মাথা মুড়োতে গিয়ে আমরা সমাজ-সংসারে পর্বতপ্রমাণ অনাত্মীয়তা পুঞ্জীভূত করে

তুলেছি। আমরা মানুষকে দুহাতে দূরে ঠেলে দিতেই যেন সমধিক ব্যস্ত।

অপরের অহেতুক কৌতূহল রোধ করবার জন্যই যদি পর্দার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে বলব মানুষের গোপনতাপ্রীতি এই কৌতূহলে আরও ইন্ধন জোগায় মাত্র। উৎকট নিভৃতির আকাঙ্ক্ষা ও আত্মমগ্ন থাকবার বিলাস অনুচিত ঔৎসুক্য ও কৌতূহলকে সমধিক আকর্ষণ করে। আমি যদি আপনাকে নিয়ে আপনি সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকতে চাই তা হলে অবধারিত ধরে নিতে পারি যে, আমার উপর অপরের অসুস্থ কৌতূহলের মার এসে পড়বেই পড়বে। বস্তুতঃ, ব্যষ্টির আত্মকেন্দ্রিকতা আর সমষ্টির কৌতূহল একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ মাত্র। মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী স্পষ্টই সম্পূর্ণতঃ প্রকাশ্য হওয়া সম্ভব নয়। তবু ওরই মধ্যে যতদূর সম্ভব বেশী সামাজিকতার তথা প্রতিবেশিপরায়ণতার আবহাওয়া সঞ্চালিত হওয়া দরকার।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে সামাজিক পর্দা-প্রথা আর আলোচ্য পর্দা-প্রথায় বিশেষ ভেদ নেই। পর্দা-প্রথা আমাদের দেশের মেয়েদের বহু প্রকারে ক্ষতি করেছে। মেয়েদের তথাকথিত আব্রুর শুচিতা রক্ষা করতে গিয়ে পর্দা বহুকাল তাদের বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অসূর্যম্পশ্যা অর্থাৎ জবুথবু বানিয়ে রেখেছিল। অতীতে পুরুষের মানসিকতায় তাতে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মেয়েদের প্রতি যথার্থ সম্ভ্রম ও শালীনতাবোধের উন্মেষের পথে পর্দাই ছিল এতকাল সব চাইতে বড় বাধা। সুখের বিষয়, হালে এ অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। পর্দা-প্রথার পূর্বকঠোরতা আজ বহুল পরিমাণে শিথিল। এতে যে নরনারীর সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সামাজিক পর্দা-প্রথা সম্পর্কে যদি এই কথা সত্য হয়, গার্হস্থ্য পর্দা-প্রথা

সম্পর্কেই বা সে কথা সত্য হবে না কেন। গার্হস্থ্য পর্দা-প্রথার ঘেরা-টোপে মানুষ নিকটতর হয় কি দূরে সরে যায় সুধীজন বিবেচনা করে দেখবেন।

পর্দা-প্রথার বিরুদ্ধে আমার এ সকল যুক্তি আমার এক বন্ধু আদৌ স্বীকার করেন না। তিনি সব ব্যাখ্যার মধ্যেই ব্যাখ্যাতার মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, এ ক্ষেত্রেও তাঁর মনোভাব তদ্রূপ। বন্ধুপ্রবরের স্পষ্ট বক্তৃতার খ্যাতি আছে, কিন্তু লোকে ঠোঁটকাটা বলে তাঁর দুর্নাম করে। তিনি সকলের সামনে খোলাখুলিই আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আসলে উদ্বৃত্ত অর্থের সঙ্গতি নেই বলেই আমি স্বীয় আচরণ সমর্থনের জন্য পর্দা-প্রথার বিরুদ্ধে মনগড়া অভিযোগের ফিরিস্তি ফেঁদেছি। এ ছাড়া আমার আচরণের অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না।

বাস্তবিক, সমস্যার এ দিকটা একবারও চিন্তা করে দেখা হয় নি। নিতান্ত স্বল্পবিত্ত লেখনী সঞ্চালনকারী মধ্যশ্রেণীর মানুষ, পর্দাবিলাসের মাশুল যোগাবার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার কোথায়। এবার মনে হচ্ছে আর কালবিলম্ব না করে যেভাবেই হোক পর্দা কিনে আনা উচিত। জানলায় দরজায় পর্দা না চড়ানো পর্যন্ত বুঝি স্বস্তি পাব না। তাতে কিঞ্চিৎ অযথা অর্থ ব্যয় হয় হোক, কিন্তু দারিদ্র্যটুকু তো ঢাকা পড়বে।

কনে-দেখা

প্রথা বা আচার জিনিষটার রীতি বড় অদ্ভুত। সমাজ যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যায়, অথচ প্রথা পুরাতন অভ্যাসের বশে তখনও নিজেকে অবিকৃত ভাবে জীইযে রাখতে চেষ্টা করে। প্রথার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তবু সে মরেও মরতে চায় না। সামাজিক অগ্রগতির ছন্দের সঙ্গে যখন পুবাতন কোন আচার বা অনুষ্ঠানের এইরূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য বেমিল ঘটে তখনই সমাজের মধ্যে দেখা দেয় অসামঞ্জস্যজনিত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। পরিবর্তিত পবিস্থিতির মধ্যেও পুরাতন সংস্কার বা অভ্যাসের অজুহাতে প্রাচীন প্রথা আঁকড়ে থাকবার মূঢ় প্রযাস জাতীয জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করে তার ভয়াবহতা বড় কম নয।

এক সময়ে আমাদের দেশে অনাত্মীয় বা অপবিচিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কথাবার্তা বা মেলামেশার রেওয়াজ ছিল না। এখন সে রক্ষণশীলতা বহুল পরিমাণে অন্তর্হিত হয়েছে। সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার চাপে এখন আর অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পূর্বের মতো মেলামেশার বাধা নেই। ছেলেরা এবং মেয়েরা আজ বহির্বিশ্বের কর্মজীবনেব সাধারণ ভূমিতে অসঙ্কোচে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য পুবাতন সঙ্কোচ একেবারে দূর হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। এখনও গোঁড়া মহলের লোকদের ভিতর স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক মেলামেশার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি দেখা যায়; বিশেষ, পল্লী-অঞ্চলে অদ্যাবধি পুরাতন সংস্কারেরই একাধিপত্য। তবে সমাজপ্রগতিমূলক নানাবিধ লক্ষণদৃষ্টে মনে হয়, এ সংস্কার আর বেশীদিন টিকবে না।

এই যেখানে সামাজিক পরিস্থিতি, সে স্থলে কনে-দেখা নামক পুরাতন সংস্কারটিকে আঁকড়ে থাকবার কী সার্থকতা থাকতে পারে। বিবাহযোগ্য তরুণ-তরুণীরা স্বীয় রুচি পছন্দ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা-অসমতা অনুযায়ী স্বকীয় জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করবে এইটেই আজকের দিনে প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, আত্মনির্বাচিত বিবাহের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, এ কথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। আর আত্মনির্বাচিত বিবাহের সংখ্যা যত বেড়ে যাচ্ছে অভিভাবকদের ইচ্ছার উপর নিভরশীল বিবাহের সংখ্যাও তদনুপাতে কমে আসছে। অভিভাবক-ব্যবস্থিত বিবাহের অর্থ হল দর-কষাকষির বিবাহ, ঠিকুজী-কোষ্ঠী গোত্র মেল প্রবর ইত্যাদি তথাকথিত সাদৃশ্যলক্ষণ মিলিয়ে বিবাহ, কন্যাপক্ষের অসহায়তার সঙ্গে বরপক্ষের জুলুমবাজীর বিবাহ, স্বকীয় ইচ্ছা ও পছন্দবিহীন ব্যক্তিত্ববর্জিত প্রাপ্তবয়স্ক দুটি পুতুলের বিবাহ। অভিভাবক-নির্দেশিত বিবাহে ছেলে মেয়েকে বিবাহ করে না, বিবাহ করে এক পরিবার আর-এক পরিবারকে, পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা সেখানে নিতান্ত গৌণ, যদিও পাত্রপাত্রীর সম্ভাবিত মিলন উপলক্ষেই যত কিছু আয়োজনের সমারোহ। এ জাতীয় বিবাহের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে এতে সমাজের ভালো বই মন্দ হবে না।

যুবকযুবতীদের স্বনির্বাচিত বিবাহে বিচারের ভ্রান্তি ঘটে না এমন নয়। যৌবনোচিত মোহে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। তবু অভিভাবক-নির্দেশিত বিবাহের কুফল আর স্বনির্বাচিত বিবাহের কুফল পাশাপাশি মিলিয়ে বিচার করলে স্বনির্বাচিত বিবাহ-বিধিকে অনেক গুণ বেশী প্রশস্ত বলে মনে হবে। প্রথমতঃ, স্বনির্বাচিত বিবাহ-ব্যবস্থায় পণ-প্রথার হাঙ্গামা অনেক কম। দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত বংশকৌলীন্য আর বনেদিয়ানার লক্ষণ মিলিয়ে পাত্র পাত্রীর

মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধবার কুসংস্কার এ স্থলে প্রায় অনুপস্থিত বললেও চলে। তৃতীয়তঃ, কর্তৃত্বাভিমানী অভি- ভাবক সম্প্রদায়ের পক্ষে সেখানে প্রাপ্তবয়স্কের ব্যক্তিত্বের অবদমনের সুযোগ সঙ্কুচিত; সর্বোপরি,কনে-দেখা রূপ বর্বর প্রথার দাসত্ব-বন্ধন সেখানে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। স্বনির্বাচিত বিবাহে কনে-দেখার ঝামেলা নেই, কারণ পাত্র-পাত্রী পূর্ব থেকে পরস্পরের পরিচিত। ঘনিষ্ঠ মেলা- মেশার মধ্য দিয়ে যেভাবে পরস্পরকে জানবার চেনবার সুযোগ হয় একদিনের স্বল্পক্ষণস্থায়ী দেখায় বা জিজ্ঞাসাবাদে কখনও সে জাতীয় পরিচয় অধিগম্য হবার নয়। অভিভাবকের দল বিচক্ষণ হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা সর্বজ্ঞ নন। তাঁদের নির্বাচনে ভুল হতে পারে, হয়েও থাকে। কন্যার সুলক্ষণ বিচার করতে গিয়ে প্রায়ই তারা কন্যাপক্ষের অর্থক্ষমতা বংশকৌলীন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অবান্তর প্রসঙ্গের বিচার-বিবেচনা করেন। যত বেশী দাঁও মারবার সম্ভাবনা, কন্যার মূল্য ও মর্যাদা প্রায়শ তদনুপাতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অভিভাবক-নির্দেশিত বিবাহের এই হল রীতি, এ ক্ষেত্রে পদে পদে বিচারবিভ্রাট না ঘটে পারে না।

বিবাহ-ব্যাপারে অভিভাবক শ্রেণীর বিবেচনাহীনতা পণ-প্রথায় যেমন সুপ্রকট, কনে-দেখায়ও তেমনি। শুধু বিবেচনাহীনতা বললে কম বলা হয়, কনে-দেখা রূপ প্রাক্-বিবাহ পর্বটি এক ঘোরতর হৃদয়হীন ব্যাপার। পৃথিবীতে যত রকম পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এর চাইতে অপমানজনক এর চাইতে নিষ্ঠুর পরীক্ষা বুঝি আর কিছু হতে পারে না। মেয়েরা কী করে এই অপমানকর পরীক্ষার গ্লানি এতকাল নির্বিবাদে সহ্য করে এসেছেন তা-ই ভেবে এক-এক সময় আশ্চর্য লাগে। এখন তো তবু পাত্র নিজে কন্যা দেখতে আসে, তাকে মন্দের ভালো ব্যবস্থা হিসাবে কোনক্রমে মেনে নেওয়া যায়,—কিন্তু আগে কনে

দেখবার নাম করে বরপক্ষের যে কোন উটকো লোক মেয়ে দেখতে এলেও বলার কিছু ছিল না। আর সে কত রকমের খুঁটিনাটি পরীক্ষা। রান্না গান সেলাই জানা আছে কি না, শুভংকরীর হিসাব জানা আছে কি না, প্রশ্নকর্তা নিজে যে প্রশ্নের উত্তর জানেন পরীক্ষার্থিনী কন্যার ঠিক ঠিক সে উত্তর জানা আছে কি না, উদ্ভট শ্লোকের অর্থোদ্ধার ও ততোধিক দুরূহ ধাঁধাঁর জবাব কন্যা দিতে পারে কি না ইত্যাদি ও প্রভৃতি। কিন্তু এহ বাহ্য। প্রাথমিক পরীক্ষার পর সুরু হত আসল পরীক্ষা। মেয়ের হাতের তেলো ও পায়ের পাতা পরীক্ষা করে দেখা হত, মেয়েকে হাঁটিয়ে দেখা হত সে চলনক্ষম কি না, চুল ছাড়িয়ে জানতে চাওয়া হত চুল হাঁটুর গোড়া অবধি নামে কি না,—এইভাবে কন্যার চুল চোখ নাক কান মুখ কোমর পা পায়ের নখ এবং অন্যান্য লক্ষণাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হত। মেয়ের আবয়বিক কোন রকম খুঁত আছে কিনা সেটি নির্ণয় করা যদিও এই পরীক্ষার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য ছিল, বরপক্ষের প্রতিনিধিদের আচরণে এই নির্বাচিত সীমারেখা কোন সময়েই লঙ্ঘিত হত না এমন কথা বলা যায় না। পরীক্ষা কার্যটি আগাগোড়া ছিল একতরফা। কন্যাপক্ষের তরফ থেকে বাবাজীবনকে পরীক্ষা করবার কথা কারও মনে হত না, মনে হলেও সে ইচ্ছাকে আমল দেবার মতো উদারতা সেই সময়কার বরপক্ষে অনুপস্থিত ছিল। মেয়েকে যদৃচ্ছা পরীক্ষা করতে বাধা নেই, পাত্র পবীক্ষার কথা উঠলেই সহস্রবিধ ফ্যাকড়া দেখা দিত।

স্পষ্টতঃই সমস্ত ব্যাপারটি অতিশয় লজ্জাজনক। এব মধ্যে যে হৃদয়হীনতা আত্মগোপন করে আছে তার বুঝি তুলনা নেই। যে কন্যা বরপক্ষের অতিসতর্ক শ্যেনচক্ষু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারল না সেই হতভাগিনীর কথা চিন্তা করুন। লজ্জায় অপমানে আত্মধিক্কারে তার মুখ লুকোবার আর পথ থাকে না। বিধাতা যথেষ্ট পরিমাণে রূপ দেন নি,

গুণ দেন নি সে লজ্জা তো আছেই, তার উপর এই অসম্মান। এই অসম্মানের বেদনার তল কে কবে পরিমাপ করেছে। আর শুধু একবারের জন্যই তো অসম্মান নয়, কোন কোন ভাগ্যহীনা কন্যার জীবনে এই অসম্মান বারবার ঘুরে আসে। একবার কি দুবার যাকে ব্যর্থতার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে আর একবার নতুন করে বরপক্ষের পরীক্ষার সম্মুখীন হবার প্রস্তাব মাত্রে তার হাত-পা হিম হয়ে আসে। পাছে একই লাঞ্ছনাকর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে সেই ভয়ে তার মুখে ভালো কথা ফুটতে চায় না, ফলে আশঙ্কিত পরিণামটিকে সে নিজেই আরও বেশী ত্বরান্বিত করে তোলে। বরপক্ষের লোকেরা 'পরে জানাবো' বলে অলক্ষিতে মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়, কন্যাপক্ষ ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে, আর সবার অগোচরে গুরুভার নৈরাশ্যের পীড়নে কন্যার চোখে অশ্রু উদ্বেল হয়ে ওঠে।

অসহায় নারী-সমাজের এবংবিধ লাঞ্ছনা অপমানের ভিত্তির উপর যে বিবাহ ব্যবস্থার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে তার চাইতে স্বনির্বাচিত বিবাহ শতগুণে ভালো, আমি বলব। স্বনির্বাচিত বিবাহের আর যত দোষই থাক্, এই বর্বরতা থেকে তা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

অধ্যাপক

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে জীবনব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তিকে অধ্যাপক বলা হয়ে থাকে। বাচ্যার্থে তো বটেই, লৌকিক অর্থেও বটে। কিন্তু আমাদের এই বাংলা দেশে জীবিকার সূত্রে অধ্যাপক কথাটার আর একটা বিশেষ মানে দাঁড়িয়ে গেছে। অধ্যাপক কিনা যিনি অধ্যাপনা করেন পুরাদমে, কিন্তু অধ্যয়ন নৈব নৈব চ। শেষোক্ত ব্যাপারটির সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি। পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চুকে যায়, তারপর সেই-যে অধ্যাপনার জোয়ালে সদ্য-পাশ-করা গোল্ড-মেডালিস্ট বা সিলভার-মেডালিস্ট তরুণ যুবক নিজেকে জুড়ে নেন, সেই থেকে পড়াশুনার কারবার খতম; কলেজ-পড়ুয়া তরুণ শিক্ষার্থীদের কাঁচা মাথার উপর দিয়ে দিনের পর দিন একই বক্তৃতার মই চালানো ছাড়া তখন আর তাঁর কিছু করবার থাকে না।

অধ্যাপকশ্রেণীর অধ্যয়ন-বিমুখতার সমালোচনা বৃথা। আমাদের দেশের যেরকম শিক্ষা-ব্যবস্থা, তাতে তাঁরা বক্তৃতার আর্ট মক্স করা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারেন? কলকাতায় যতগুলি বে-সরকারী কলেজ আছে তাদের সব ক'টিরই একমাত্র লক্ষ্য হল কিসে বেশী-সংখ্যক ছাত্র আকর্ষণ ও আমদানী করা যায়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি কলেজেই ক্ষেপে ক্ষেপে শিক্ষা-দানের পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা। সকাল দুপুর বৈকাল সন্ধ্যা রাত্রি—যখনই কলেজের পাশ দিয়ে যাওয়া যায়, দেখা যাবে ভিতরে কোন না কোন ক্লাশ চলছে। আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রবীণ শিক্ষাকর্তাদের অপরিসীম করুণা। ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণার্থে থাবলা থাবলা শিক্ষা খয়রাত করবার জন্য তাঁরা

যেন সদাব্রত খুলে রেখেছেন। সকাল হোক দুপুর হোক সন্ধ্যা হোক যখনই হাত বাড়াবে তোমার দু অঞ্জলি পুরে বিদ্যারূপ পরম অমৃত ঢেলে দেবার জন্যে তাঁরা আগু বাড়িয়েই আছেন। বিদ্যা-বিতরণের এমন নিঃস্বার্থ সদাপ্রস্তুতি ও ঢালাও আয়োজন অন্যত্র দুর্লভ।

এই যেখানে শিক্ষা-ব্যবস্থার চেহারা সেখানে অধ্যাপক নামধেয় ব্যক্তিরা রসনা সঞ্চালনপটুতার অনুশীলন ছাড়া আর কোন্ কাজেই বা সময় দিতে পারেন? মাইনে তো পান মোটে এক ক্ষেপে একশোটি তঙ্কা। উর্ধ্বে একশো পঁচিশ। সকলেরই স্ত্রী-পুত্র সংসার আছে, মধ্যবিত্ত পরিবারে অন্যান্য পোষ্যের দায়-দায়িত্বও কম নয়। সুতরাং এক ক্ষেপের পারিশ্রমিকে পোষাবে কেন। মধ্যবিত্ত সংসারের প্রয়োজনের গর্তে যত টাকাই নিক্ষেপ করা যাক, দেখতে না দেখতে তলিয়ে যায়। কাজেই প্রতিটি অধ্যাপককে সংসার প্রতিপালনের জন্য একাধিক ক্ষেপে অধ্যাপনাকার্যে আত্মনিয়োগ করতে হয়। ফলে পড়াশুনার সময় থাকে না, ক্লাশ আর বাড়ী, বাড়ী আর ক্লাশ— এই করেই অধ্যাপক মহোদয়ের গোটা সময় কেটে যায়। অধ্যাপকের অধ্যয়ন-স্পৃহা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না; ছাত্রদের সামনে যিনি যত অক্লান্তভাবে বক্তৃতা পিটতে পারেন অধ্যাপক হিসাবে তাঁর সাফল্য তত সুনিশ্চিত।

কলেজের শিক্ষা কর্তারা আবার শুধু বক্তৃতায় সন্তুষ্ট নন, ছাত্রদের কিছু কিছু করে 'নোট' দেবার রেওয়াজ সকল কলেজেই প্রচলিত। শ্রমক্লান্ত অধ্যাপকের পক্ষে এটি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণ হলেও এক হিসাবে তা মন্দের ভালো এই জন্য যে, ওই সুবাদেই যা অধ্যাপকের যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া হয়ে থাকে; নইলে ও পাট তো কবেই চুকিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে। এক কালের পাঠ্য নতুন করে

ছেলেদের সামনে ওগ্‌ড়ানো এবং বৎসর বৎসর ওই একইঅভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া যখন পেশাদার অধ্যাপকের আর বিশেষ কিছু করণীয় নেই, তখন নোট তৈরীর ছলে খানিকটা সময় রচনাকার্যে মনোনিবেশ করতে পারাটা কম কিসে। অধ্যাপকের পক্ষে ওটা রুটিন-কাজের বহির্ভূত, সুতরাং আমোদজনক। মানসিক অনুশীলনের দিক দিয়ে বিচার করলে লাভজনকও বটে।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলি। আমাদের পেশাদার লিখিয়েদের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি পেশাদার অধ্যাপকদের প্রবল অবজ্ঞা। অধ্যাপকদের ভাবখানা এই যে, লেখকের বেশীর ভাগ সময়ই তো কাটে লেখা-লেখা খেলায়; তাঁদের বইপত্র ঘাটাঘাঁটি করবার সময়ই বা কোথায় মানসিক প্রস্তুতিই বা কই। যেন লেখকেরা সব ভূমিষ্ঠ হবা মাত্র কলমের সাধনায় লেগে গেছেন। তাঁদের লিখন-নৈপুণ্য অর্জন করতে হয় নি, লিখনযোগ্য বিষয়ে অধিকার লাভের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় নি। অধ্যাপক মহাশয়েরা একবার কাগজে কলম ছুঁইয়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল হয়। সচকিত হয়ে তাঁরা লক্ষ করবেন, বলা যত সহজ লেখা তত সহজ নয়। গাদা গাদা বই মোটা মোটা বই অনেকেই পড়তে পারেন, সে সকল বইয়ের অন্তর্গত বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেওয়াও কিছু কঠিন নয়; কিন্তু লেখা জিনিষটা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ও বস্তু সকলের জন্য নয়। লেখকদের জাতই আলাদা। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া শ্রেষ্ঠ পদভারাক্রান্ত উপাধিক পণ্ডিত না হতে পারেন, কিন্তু লেখনী-সঞ্চালনে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। রসনা, সঞ্চালনপটু পেশাদার অধ্যাপক লেখনী সঞ্চালনে হস্তক্ষেপ করলেই এ কথার যাথার্থ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন।

যাক সে কথা। অধ্যাপকশ্রেণীর যোগ্যতার উপর কটাক্ষ হানবার জন্য এ রচনার অবতারণা করা হয় নি। পক্ষান্তরে, অধ্যাপকদের শ্রেণীগত সত্তার সহানুভূতিপূর্ণ বিশ্লেষণই এ নিবন্ধের মুখ্য অভিপ্রায়। অতএব সে দিকেই রচনার মুখ ফেরানো যাক।

বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত অধ্যাপক—নিতান্ত ছা-পোষা সাদাসিধে প্রাণী। নিরীহ, শান্ত, ভীতু। অনেকে তাঁদের অধ্যাপক নামকরণে আপত্তি করেন এই যুক্তিতে যে, অধ্যাপক নাম শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় প্রবীণ ও সুযোগ্য শিক্ষাব্রতীরই গ্রহণীয়, যাঁকে-তাঁকে অধ্যাপক নামে অভিহিত করে নামটিকে বড্ড বেশী সস্তা করে তোলা হয়েছে। অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এ দেশেরও কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধ্যাপক' নাম শুধু তিনিই ব্যবহার করতে পারেন যিনি পদাধিকারবলে এই অধিকার অর্জন করেছেন—শিক্ষাব্রতী মাত্রেই নির্বিচারে এই নাম গ্রহণ করতে পারেন না। নির্দিষ্ট মাসোহারার বিনিময়ে কলেজে যাঁরা সম্বৎসর বিদ্যা-বিতরণে নিয়োজিত তাঁদের অধিকাংশ আসলে হলেন তথাকথিত শিক্ষক; শিক্ষককে অধ্যাপকের পর্যায়ে উন্নীত করে আমরা একটা স্বতন্ত্র গালভরা নামধারী বৃত্তিজীবী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছি, যাঁরা মূলতঃ শিক্ষকশ্রেণীরই স্বগোত্র।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই আপত্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। একে তো ওই মাইনে, তার উপর প্রচণ্ড খাটুনি। কলেজের নির্ধারিত কাজেব বাইরে দুটো তিনটে ট্যুইশান করেও সংসার চলে কি চলে না। এর পরে যদি আবার অধ্যাপক নামটিও খারিজ হয়ে যায় তা হলে অধ্যাপকের জীবনে সান্ত্বনা লাভের উপকরণ আর কী থাকে? আসলে স্কুলের শিক্ষক আর কলেজের তথাকথিত অধ্যাপকের ভিতর পদমর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই, উভয়ের বেতনগত অবস্থাও প্রায়

সমান-সমান, শুধু ওই নামেই যা তফাৎ। ওই নামের ক্ষেত্রেও যদি আবার সমীকরণের বায়না উত্থাপন করা হয় তা হলে অধ্যাপক বেচারা দাঁড়ান কোথায়? এ সংসার বড় বিচিত্র জায়গা। প্রত্যেকটি নির্যাতিত শ্রেণীই আত্মসন্তুষ্টির ঠেকো দিয়ে কোন না কোন ভাবে আত্মসম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখবার প্রাণান্তকর সাধনায় নিরত। বাংলা দেশের অধ্যাপক শ্রেণীকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করা চলে না। তাঁরা অধ্যাপক নামের ঠেকো দিয়ে কোনও প্রকারে নিজেদের টাল-মাটাল অবস্থাকে সামাল দিয়ে রাখছেন। অধ্যাপকের হীনাবস্থার ক্ষতচিহ্নের উপর অধ্যাপক অভিধাটি হল মোলায়েম সান্ত্বনা-প্রলেপ। প্রলেপের আবরণ সরিয়ে অধ্যাপকের প্রকৃত অবস্থা লোকচক্ষে প্রকটিত করলে সত্যের মর্যাদা হয়তো রক্ষা পায় কিন্তু সত্যনিষ্ঠার ফাঁক দিয়ে প্রকাশ পায় হৃদয়হীনতা। হৃদয়হীনতার সমর্থন করতে আমি নারাজ।

বাংলা দেশের গড়পরতা অধ্যাপক সমবেদনার যোগ্য বেচারা এক প্রাণী। সমবেদনার যোগ্য বিশেষ এই কারণে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাঁরা যখন সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন—বিদ্যাবুদ্ধি নিয়েই প্রবেশ করেন, কিন্তু এমনি এই পোড়া দেশের সব কাণ্ড-কারখানা, কর্মজীবনে তাঁরা তাঁদের অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি খাটাবার সুযোগ পান না; অসার ক্লাশ-লেকচার আর ততোধিক অসার প্রাইভেট মাষ্টারি করে তাঁদের গোটা জীবন ক্ষয়িত হয়। দিনগত পাপক্ষয়জনিত ক্লান্তি আর আর্থিক অসচ্ছলতার আত্মক্ষয়কারী গ্লানি তাঁদের সকল আশাভরসার সমাধি রচনা করে। যৌবনের স্বপ্ন আর প্রাণ ধারণের তুচ্ছতার নিকট হার স্বীকার করে মনের অবজ্ঞাত কোণে ধিক্কৃত মুখ লুকায়। এই যেখানে অবস্থা সেখানে অধ্যাপকের ভাগ্য নিয়ে পরিহাসের যো কোথায়? বড় জোর অধ্যাপকবৃত্তির ত্রুটি-

বিচ্যুতি নিয়ে দু'চারটি অনিষ্টসম্ভাবনাহীন বিদ্রূপ মন্তব্য করা যেতে পারে—তার বেশী নয়। আমরা যাঁরা নির্যাতিত শোষিত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, তাঁদের সকলেরই জীবনে কিছু না কিছু হাস্যকরতার উপাদান আছে। তাই বলে নিজেদের প্রতি আমরা নিষ্করুণ হতে পারি কি? যে সামাজিক পরিবেশের ভিতর আমরা বাস করি সেই পরিবেশটাই আমাদের জীবনে হাস্যকরতার সৃষ্টি করেছে, সুতরাং দোষ দিতে হলে সমাজকেই দোষ দিতে হয়, সুবিধা-সুযোগ-বঞ্চিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমালোচনা অনুচিত। অধ্যাপকের দল (উচ্চ চূড়ায় আসীন ভাগ্যবান দু'চারজন বাদে) সামাজিক সুবিধা-সুযোগ-বঞ্চিত নির্যাতিত একটি শ্রেণী। তাঁরা বুদ্ধিজীবী বিধায় তাঁদের ভাগ্যহীনতা আরও বেশী মর্মপীড়াদায়ক। সুতরাং তাঁদের বেলায় উপরের নিয়মটি বিশেষ ভাবেই মনে রাখা উচিত।

অধ্যাপকের জীবনের হাস্যকরতার একটি দিক তাঁর পোশাক। একদিকে আর্থিক কৃচ্ছ্রতাজনিত হীনম্মন্যতা, অন্যদিকে ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের মোহ—দুয়ের ভিতর সমন্বয় বিধানের কী প্রাণান্তিক প্রয়াস! বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-পাশ-করা কমনীয়দর্শন তরুণ—গোঁফ উঠেছে কি ওঠে নি—তাঁকেও যখন ভারিক্কি চালে গলায় চাদর ঝুলিয়ে যেতে দেখি, হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই নে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মান বজায় রাখবার জন্যে গাম্ভীর্য-সাধনা একেই বলে। অন্যপক্ষে, দীর্ঘদিন যাঁরা এই লাইনে আছেন, অধ্যাপনাতেই চুল পাকিয়েছেন, সেইসব প্রবীণ শিক্ষাব্রতীর অধিকাংশের অবধারিত পোশাক হল ছেঁড়া গলাবন্ধ কোট, ময়লা তেলচিটচিটে উড়ুনি, পাড়হীন সস্তা ধুতি এবং পায়ে বিদ্যাসাগরী তালিমারা চটি। মুখ শুষ্ক, গাল তোব্ড়ানো, চক্ষু কোটরগত। তিন চার দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে কলেজে যেতে সংকোচ নেই, এমন কি ছাত্রীদের ক্লাশেও অবাধে যাওয়া চলে, কেন না যে মন অপরের নিকট

নিজেকে প্রিয়দর্শন করে তোলায় অভিপ্রায় দান করে সে মন আজ অপগত। পূর্বকালে অপ্সরীরা মুনি-ঋষিদের চিত্তবিকার ঘটাত, অপ্সরীরা দারিদ্র্যতার প্রপীড়িত প্রবীণ অধ্যাপকের উপর তাদের জারিজুরি পরীক্ষা করে নি, করলে ব্যর্থ হত, এ কথা নিশ্চিত বলতে পারি।

সাংবাদিক

বাংলা দেশে যতগুলি জীবিকা আছে তার ভিতর সাংবাদিকের জীবিকা হল সব চাইতে আকর্ষণীয়, সব চাইতে রোমাঞ্চপূর্ণ, অথচ সব চাইতে অনিশ্চিত। বোধ করি সাংবাদিকতার ভিতর নাটকীয়তার লক্ষণ প্রবল বলেই জীবিকা হিসাবে তা এমন উদ্বেগশঙ্কাপূর্ণ। এই বৃত্তির প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট হবেন তাঁদের পূর্বাহ্নেই জানা থাকা দরকার, তাঁরা যে-কোন মুহূর্তে কর্মচ্যুত হতে পারেন। ডেমোক্লিসের তরবারির মত ছাটাইয়ের খড়্গ সব সময় তাঁদের মাথার উপর ঝুলে আছে। কিংবা এমন হতে পারে, যে সংবাদপত্রে তাঁরা কর্মরত আছেন সেটি কোন কারণ বশতঃ সহসা উঠে গেল, সে ক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেকের আকস্মিক কর্মহীনতা অবধারিত। সাংবাদিকের বৃত্তি বরণ করতে হলে আগেভাগে এইসব প্রতিকূল সম্ভাবনা মেনে নিয়েই এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। যাঁরা তা করেন না, দুদিন আগে হোক পরে হোক তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ অনিবার্য।

আশার কথা, আমাদের দেশের সাংবাদিকদের মধ্যে অধিকাংশ তাঁদের জীবিকার এই অনৈশ্চিত্য সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা সব জেনেশুনেই এ পথে আসেন। সাংবাদিকবৃত্তির প্রতি তাঁদের মোহ প্রচুর, কিন্তু এই বৃত্তি অবলম্বন করে অর্থবান হবার মোহ তাঁদের নেই। তাঁরা জানেন, সাংবাদিকতা অবলম্বন করে এ দেশে কেউ কখনও অর্থবান হন নি, হতে পারেন না; প্রতিষ্ঠাবান হওয়া তো দূরের কথা। বরং উল্টো সম্ভাবনা পদে পদে। নিজেকে মোটামুটি উপবাসী রাখা যায় তদুপযোগী মাহিনা, অভাব-অনটন, অনৈশ্চিত্যজনিত উদ্বেগ—এ সব বাংলা দেশের সাংবাদিকের নিত্য ভাগ্য।

তবু কেন সাংবাদিক সব ছেড়েছুড়ে সাংবাদিকতাকেই জীবনব্রতস্বরূপ

গ্রহণ করেন? এইখানেই রহস্য। প্রশ্নটিকে একটু বিস্তারিতভাবে নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে।

আমাদের সাংবাদিকদের মানসিক গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ঠিক 'জীবিকার জন্যই জীবিকা' হিসাবে এঁরা কেউ সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেন নি। একটা রোমান্টিক কল্পনা, একটা আদর্শবাদ, একটা ভাবালুতা-ময় স্বপ্ন অধিকাংশেরই মনোভঙ্গীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে অনেকে প্রথম জীবনে দেশের জন্য দুঃখবরণ করেছেন, অত্যাচার নির্যাতন সয়েছেন; তারপর দেশপ্রেমের অন্যতম স্বাভাবিক পরিণতিরূপে সাংবাদিকতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। বাংলায় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাংবাদিকতার সম্পর্ক নিগূঢ়। সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে জাতিকে সেবার আদর্শ আমাদের নেতৃবর্গের একাংশকে বরাবর গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবর্গ সাংবাদিকতাকেই মুখ্যতঃ দেশসেবার উপায়স্বরূপ অবলম্বন করেছিলেন। বলতে গেলে তাঁদের চোখে দেশসেবা আর সংবাদপত্র-সেবা অভিন্ন ছিল। পূর্বগামীদের এই দৃষ্টান্ত একালীন বহু আদর্শবাদী তরুণ সাংবাদিকের কল্পনাকে উচ্চকিত করেছে। তাঁরা ইংরাজের জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে সটান্ সাংবাদিকের টেবিলে এসে বসেছেন। যে আদর্শবাদ একদিন তাঁদের দেশের জন্য সকল অত্যাচার লাঞ্ছনা হাসিমুখে সইবার প্রেরণা দিয়েছিল সেই একই আদর্শবাদ পরবর্তীকালে তাঁদের হাতে কলম গুঁজে দিয়েছে। লেখনীসঞ্চালনে তাঁরা কৃতিত্বও দেখিয়েছেন।

অনুমান করি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাহিত্যস্পৃহার কোথায় একটা অদৃশ্য সম্পর্ক আছে। তা যদি না হত তা হলে দেশের জন্য লাঞ্ছনা বরণ-কারীদের একটি অংশ সংবাদপত্র সেবার দিকে অনিবার্যভাবে ঝুঁকতেন

না। অন্যান্য দেশেও দেখা যায়, তরুণ বয়সে দেশের জন্য দুঃখ সয়েছেন এমন অনেক ব্যক্তি উত্তর জীবনে শিল্পী-সাহিত্যিক-লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে রাশিয়ায় এই দৃষ্টান্ত প্রবল। টুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভ্স্কি, লার্মণ্টভ, গর্কি এবং বর্তমান রাশিয়ার অনেকানেক লেখক তাঁদের প্রথম জীবন সুরু করেছিলেন রাজনীতি দিয়ে। রাজনীতির উৎসাহ পরবর্তীকালে সাহিত্যের খাতে চালিত হয়ে তাঁদের বিশেষ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বলে মনে করি। কথাটা যে অনুমানমাত্র নয়, বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা বাংলার সাংবাদিকদের একাংশের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে।

রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্য সেবা বা সংবাদপত্র সেবার ঘনিষ্ঠতার একটা কারণ বোধ করি এই যে, বালকমনে যখন প্রথম দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয় সেটি প্রধানতঃ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই উপ্ত হয়। দেশপ্রেম বস্তুটি ভুইফোঁড় নয়। তারও একটি মানসিক প্রস্তুতির অধ্যায় আছে। বালকমাত্রের মধ্যেই যদি দেশপ্রেম প্রবল হত তা হলে ভারতবর্ষ আরও অনেক আগেই স্বাধীন হত। এই-যে মানসিক প্রস্তুতি, এটি মুখ্যতঃ সাধিত হয় সাহিত্যপ্রীতির মধ্য দিয়ে। দেশ বিদেশের জাতীয়তাবাদী সাহিত্য এবং স্বদেশপ্রাণ বীরদের কীর্তি-কাহিনী পাঠে বালকমন বিশেষ-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, সেই অনুপ্রাণনার ফল পরে রূপান্তরিত হয় দেশ-সেবার মধ্যে। অবশ্য অগ্রগামীদের এবং নিকট-পরিধির অন্তর্গত বর্ষীয়ানদের সদ্দৃষ্টান্ত কিশোরমনে দেশপ্রেম সঞ্চারে অনেকখানি সহায়তা করে সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল প্রেরণাটি আসে সাহিত্যের খাত বেয়ে সে কথা জোর করে বলা যায়। সাহিত্যপ্রেম ছেড়ে এক কদম পা বাড়ালেই দেশপ্রেম। পক্ষান্তরে, দেশপ্রেমের অন্যতম পরবর্তী স্তর হল সাহিত্য।

এত কথা বলছি এটি বোঝাবার জন্যে যে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংবাদপত্র সেবার সম্পর্কটা কিছু আকস্মিক সম্পর্ক নয়। দুয়ের ভিতর মৌলিক যোগ বর্তমান। যে সাহিত্যপ্রেম জাতীয়তাবাদের মূলে, সেই একই সাহিত্যপ্রেম সংবাদপত্র সেবার প্রধান কারক। সুতরাং দেশ-সেবীকে সংবাদপত্রসেবী হতে দেখলে চমকে উঠবার কিছু নেই, বরং এইটেই প্রত্যাশিত, এইটেই স্বাভাবিক।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করব, স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয় সংবাদ-পত্রের স্বরূপের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার পূর্বেকার নিগূঢ় যোগ আর নেই—ঐতিহাসিক কারণেই আর নেই—এবং আমাদের সংবাদপত্রগুলি যে ক্রমশ অন্যান্য দশটা ব্যবসায়িক সংগঠনের ন্যায় নিছক মুনাফা আহরণের যন্ত্ররূপে গঠিত হচ্ছে সে লক্ষণও অতি স্পষ্ট। কিন্তু তা হলেও বলব, ভারতীয় সংবাদপত্রের ঐতিহ্য থেকে দেশপ্রেমের কল্পনা কোন সময়েই একেবারে বাদ যাবে না। একভাবে না একভাবে তা আমাদের সাংবাদিকদেব একাংশকে অনুপ্রাণিত করবেই। জাতীয়তাবাদ গেছে তো আছে সোশালিজ্‌ম্‌ কম্যুনিজ্‌ম্‌, নিউ হিউম্যানিজ্‌ম্‌, সর্বোদয় প্রভৃতি আধুনিক চিন্তাদর্শ। এগুলি আজকের দিনের সাংবাদিকের কল্পনাকে উচ্চকিত না করে পারে না।

এর পর সাহিত্যিক। সাহিত্যযশোপ্রয়াসীদের মধ্যে অনেকেই অব-ধারিতভাবে তরুণ বয়সে সংবাদপত্রসেবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন, এ আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। এমন অনেক সাহিত্যব্রতী তরুণ যুবকের কথা জানি যাঁরা সরকারী কি অন্যান্য ভালো চাকুরির নিশ্চিত সম্ভাবনা দু'পায়ে মাড়িয়ে সাধ করে সাংবাদিকের অনিশ্চিত ভাগ্য বরণ করে নিয়েছেন। বৃহত্তর যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধমাত্র সাহিত্য-প্রীতির খাতিরে সাংবাদিক বৃত্তি বরণ করে নিয়েছেন এমন মানুষের

দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নেই। কেন এমন হয়? কেন এই সব উদীয়মান লেখকের দল ধ্রুব লাভ বর্জন করে এইভাবে অধ্রুবের পশ্চাতে ধাওয়া করেন? কোন্ প্রেরণা তাঁদের এই মরীচিকা অন্বেষণে ব্রতী করে?—এক কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলব, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অন্তরের সুগোপনে লালিত একটা রোমান্টিক ভাবকল্পনাই এই আপাতদুর্বোধ্য আচরণের মূলে। সাংবাদিক বৃত্তির আর যত গলদই থাক্ এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সাংবাদিকের কাজ অশেষ উত্তেজনাকর। সংবাদপত্রের পংক্তিতে পংক্তিতে 'থ্রিল' জড়িয়ে আছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে যে মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে, দৈনিক সংবাদপত্র আপিসের 'টেলিপ্রিণ্টার' যন্ত্রের ভিতর ক্ষুদ্র আধারে তারই সশব্দ পুনরাবৃত্তি। সাংবাদিকেরা পরোক্ষভাবে এই মহানাটকের সহিত আপনাদের ভাগ্য জড়াবার সুযোগ পান, সেই কারণে স্বপ্নালু তথা অ্যাড্ভেঞ্চারপ্রিয় প্রাণ মাত্রই সংবাদপত্র সেবার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে থাকেন। ধ্বংস অনিশ্চিত জেনেও পতঙ্গ যেমন অগ্নি অভিমুখে প্রধাবিত হয় তেমনি বৃত্তির অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও রোমান্টিক মন সাংবাদিকতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। সাহিত্যিক বা সাহিত্যপ্রয়াসীর মন রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনায় ভরপুর। জীবন, জগৎ আর মানুষকে তার দেখবার ধরন আলাদা। বাস্তববাদীই হোন আর আদর্শ-বাদীই হোন, সাহিত্যিক কখনও পৃথিবীকে গতানুগতিক দৃষ্টিতে দেখেন না। জীবন তাঁর চোখে এক মহানাটক। অন্যার্থে এক বিরাট জুয়া খেলা। জুয়াখেলায় নিঃস্ব হবার ভয় থাকে। কিন্তু তদ্‌গত আনন্দের সম্ভাবনাও প্রচুর। এই আনন্দের সম্ভাবনাই সংবাদপত্র সেবার দিকে স্বপ্ন-বিলাসী সাহিত্যিক মনকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ঠেলে দেয়।

কেউ কেউ বলবেন, সাহিত্যিক ভাবাব্যবসায়ী, সংবাদপত্রসেবীও

তাই, এই কারণেই এ দুটি বৃত্তির ভিতর এমন নিকট সম্পর্ক। এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। সত্য বটে সাহিত্যের ন্যায় সংবাদপত্রসেবাও মূলতঃ ভাষাশিল্পের অনুশীলন, কিন্তু দুয়ের ভিতর মেজাজগত ব্যবধান যোজনব্যাপী। সংবাদপত্রের ভাষা নগদ কারবারে বিশ্বাসী, সাহিত্যের ভাষার প্রকৃত রূপ ও অর্থ ধীরে ধীরে মনের ভিতর সঞ্চারিত হতে থাকে। একটির ফলপ্রাপ্তি আশু কিন্তু অস্থায়ী, অপরটির প্রভাব-প্রক্রিয়া ক্রমিক কিন্তু স্থায়ী। সাংবাদিকতার উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ অর্থোপলব্ধিতে, সাহিত্যের প্রাণ ব্যঞ্জনায়। সংবাদপত্র কাটে ভারে; সাহিত্য কাটে ধারে। বলা কথার ধার তো আছেই, না-বলা কথার চকিত শাণিত আভাসও সাহিত্যকে কম প্রভাময় করে না।

সুতরাং, ব্যবহৃত মাধ্যমের সমতা হেতু সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষ সংবাদপত্রসেবীর খাতায় নাম লেখান এরকম অনুমান করা ভুল। আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতব। সংবাদপত্রের কাজটাই এমন যে তার ভিতর রোমান্টিক উত্তেজনার খোরাক পবতে পরতে মিশে আছে। এই রোমাঞ্চের প্রতিশ্রুতিই সাহিত্যিক বা ভাবী সাহিত্যিকের স্বপ্নালু মনকে সংবাদপত্রের দিকে আকর্ষণ করে। কলিকাতাবাসী অপ্রবীণ সাহিত্যিক-লেখকদের মধ্যে খুব কম জনাই সংবাদপত্রের আকর্ষণ উপেক্ষা করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে লেখকদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি-সচেতন, সম-সাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ধারা অনুধাবন করতে ভালোবাসেন, যাঁদের এক চক্ষু সাহিত্য, অন্য চক্ষু (প্রায়শ বাম চক্ষু) প্রগতিশীলতার উপর ন্যস্ত, তাঁদের কাছে তো সংবাদপত্র সেবা অপরিহার্য বললেই হয়। বস্তুতঃ এ দেশে সংবাদপত্রের দাক্ষিণ্যেই বামপন্থার পরিপুষ্টি।

কেরানী

সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার সময় পান চিবোতে চিবোতে, হাতে ন্যাকড়া-ঢাকা টিফিনের বাটি ঝুলুতে ঝুলুতে, কাউকে যদি হন্তদন্ত হয়ে ট্রাম কিংবা বাস ধরতে দেখেন, অবধারিত জানবেন তিনি ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলের একজন কেরানী—লেট্ হওয়ার ভয়ে মরি-কি-বাঁচি করে আপিসে ছুটছেন। লেট্ হওয়ার ভয় নিতান্ত সাধারণ ভয় নয়, তার সঙ্গে বড়বাবুর দাঁতখিচোনি অভ্রান্তভাবে জড়িয়ে আছে। কেরানীদের নিয়ম ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেবার জন্য বড়বাবুর তৎপরতার অন্ত নেই। এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়েই শুধু তিনি ক্ষান্ত নন, দৃষ্টান্ত স্থাপনেও সমান উৎসাহী। বেলা ন'টা-স'নটা বাজতে না বাজতেই তিনি আপিসে এসে হাজির। ওভার-পাংচুয়াল আর কাকে বলে। একদিনের তরেও বড়-বাবুর কামাই হবার যোটি নেই, তা হলে এতশত কেরানীকে সামলাবে কে? আকাশের ধ্রুবতারার মতো আপিসে বড়বাবুর উপস্থিতি সদাস্থির ও অচঞ্চল, আপিস উল্টাতে পারে, বড়বাবুর আপিসে-আসা উল্টাতে পারে না।

বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতির' পাতায় লিখেছেন, তাঁর ইংরেজীর মাষ্টারটি ছিলেন বড় নাছোড়বান্দা, ভুলেও একদিন কামাই করতেন না। বালক রবীন্দ্রনাথ মনোরম সন্ধ্যাটি পড়ার টেবিলে আবদ্ধ হয়ে থাকার ভয়ে কতদিন কতভাবে মাষ্টার মশায়ের অনু-পস্থিতি কামনা করেছেন, কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ মাষ্টার এ ব্যাপারে ছাত্রকে বাধিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সন্ধ্যা হতে না হতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গলির প্রান্তে মাষ্টার মশায়ের সদাবিদ্যমান ছাতাটি অভ্রান্তভাবে

দেখা দিত। ছাত্রের মনে সে সময়ে শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশায়ের সম্পর্কে যে সকল ভাবোদয় হত তার খানিকটা আভাস কবি লেখার ভিতর প্রকাশ করেছেন। অতি কর্তব্যনিষ্ঠ বড়বাবুর সম্পর্কে কেরানীদের মনোভাব যে একই খাত বেয়ে অগ্রসর হয় না সে কথা হলফ করে বলতে পারব না।

মাষ্টার মশায়ের যেমন ছাতা, কেরানী বড়বাবুর তেমনি গলাবন্ধ কোট। রেগে বা এর চাইতেও শক্ত কোন বিপর্যয়ে বড়বাবুর গলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গলাবন্ধ কোটের কর্তব্যনিষ্ঠায় ফাটল ধরবার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

কেরাণীরা এক আশ্চর্য সম্প্রদায়। সরকারী সদাগরী সবরকম আপিস কাছারী এঁদের জোরেই চলে, যদিও সে কৃতিত্বের সুফল এঁরা খুব কমই ভোগ করতে পান। খাটবার মালিক হচ্ছে কেরানী, বাহাদুরি নেবার মালিক অফিসার। সবরকম প্রতিষ্ঠানেই শোভা বর্ধনের জন্য উপরের দিকে কিছু সংখ্যক ফিটফাট লোক থাকে, অফিসার জাতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন সেই লোক। তাঁরা কেরানীদের হাতে-ধরা জীব, কেরানীদের সাহায্য ছাড়া এক-পা তাঁদের এগোবার উপায় নেই। অথচ আপিস-পরিচালনার সমস্ত কৃতিত্বটুকু তাঁদের উপরই প্রায়শঃ বর্তায়। কেরানীদের বেলায় অষ্টরম্ভা। রাষ্ট্রপরিচালকেরা বহু অভিজ্ঞ-তার পর এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথিবীতে যত রকমের কাজ আছে তার মধ্যে সহি করার কাজটি হচ্ছে সব চাইতে কঠিন। সেই কারণে সেই গুরু দায়িত্ব অফিসার নামধারী কর্মকুশল এক সম্প্রদায়ের উপর বিশেষভাবে অর্পিত হয়েছে। কেরানীদের সাধ্য কি সেই কঠিন দায়িত্ব নিজেরা বহন করেন। মূঢ়জনেরা বুঝতে না চাইলে কি হবে, কেরানী ও অফিসারের মধ্যে যোগ্যতার এবং তদনুপাতে পারিশ্রমিকের,

যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে রয়েছে সেটি এই কারণেই কল্প। কেরানীরা খেটে-খেটে যতই গলদঘর্ম হোন, তাঁদের এটুকু অন্ততঃ বোঝা উচিত, ওপরওয়ালারা যদি তাঁদের তৈরী নথিপত্রের গায়ে সই না করেন তাঁদের সকল আয়াসই মাটি। সকল রকম উদ্যম ও পরিশ্রমের শেষে সই হচ্ছে 'ফিনিসিং টাচ'—তরুণীর আভরণ-সজ্জার সব-শেষে যেমন কপালের টিপ। টিপ-সইটি না হলে যাবতীয় সৌন্দর্যপ্রয়াসই ব্যর্থ। অনুরূপভাবে বলতে পারি, অফিসারের অনুগ্রহ-কৃত টিপ-সইটি না হলে কেরানীর সকল শ্রম মাঠে মারা পড়বার দাখিল। কৃতজ্ঞতার আর-কোন কারণ যদি না থাকে, এই কারণে অন্ততঃ অফিসারকুলের প্রতি কেরানী-সম্প্রদায়ের নমনীয় মনোভাব পোষণ করা উচিত।

কেরানীদের জীবন সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘড়ির কাঁটার মতো মাপা। তাঁদের রুটিন নির্দেশিত কর্তব্যের তালিকায় একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর সকাল বেলার যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে তার মধ্যে বাজার, খবর-কাগজ পড়া, আপিস-যাত্রার প্রস্তুতিমূলক আরও দশটা ঝকমারির দায় সেরে ফেলতে হয়। ঝকমারির মধ্যে আছে জুতা বুরুষ করা, কোর্তা ব্রাস করা, জামা ইস্ত্রি করা, দাড়ি কামানো ইত্যাদি। তারপর কাকস্নান ও গোগ্রাসে আহারপর্ব সমাপন।

কেরানীদের মধ্যে যাঁরা বয়সে নবীন, এখনও যাঁদের কলম ধরে ধরে হাতে কড়া পড়ে নি, তাঁরা এরই ফাঁকে বাড়ীর সামনেকার রোয়াকে জমায়েত সমধর্মী বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ গালগল্প সেরে আসেন। গালগল্প বলতে সাধারণতঃ কাঁচের-গ্লাসে-করা হাফ-কাপ চা ও দৈনিক বসুমতী সহযোগে খেলাধূলা আর সিনেমার মুখরোচক আলোচনা বোঝায়। খেলার গল্পই বেশী হয়। ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক হলে মোহনবাগানের শ্রাদ্ধ, বিপরীতে, ইষ্টবেঙ্গলের মুণ্ডপাত—গল্পের এই হল প্রধান আলোচ্য

বিষয়। ফাঁকে ফাঁকে সগুদৃষ্ট বাংলা ছবির আলোচনাও চলে। খেলোয়াড়দের আর জনপ্রিয় সিনেমা-অভিনেত্রীদের জীবনবৃত্তান্তের খুঁটিনাটি ছোকরা কেরানীদের নখাগ্রে। ক্রীড়া-কৌতুক আর আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত অভিনিবেশ ছোকরা কেরানীদল যদি অন্য কোন বিষয়ের উপর অর্পণ করতেন তা হলে তাঁরা কোন্ না সমাজের মধ্যমণি হয়ে থাকতে পারতেন।

কেরানীদের এই তরল মনোভাবের জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া বৃথা। তাঁদের আপিসের কাজে বৈচিত্র্য নেই, জীবনেও বৈচিত্র্য কম। এদিকে আপিসের কাজে খাটুনি প্রচণ্ড। তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্যম আর শ্রমক্ষমতা আর সময় আপিসের কাজেই মুখ্যতঃ ব্যয়িত হয়ে যায়, তারপর আর তাঁদের বিশেষ শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। উদ্বৃত্ত স্বল্প শক্তির পুঁজি নিয়ে তাঁরা যদি অবসরের মুহূর্তগুলি মুখরোচক হাল্কা আলোচনায় ভরিয়ে তোলেন, সংসারের মূল্যবান প্রসঙ্গগুলির আলোচনায় উৎসাহ বোধ না করেন, তা হলে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। জীবনটা তো শুধু কর্তব্যের সমষ্টিই নয়, এর ভিতর বিশ্রামেরও স্থান আছে। আর বিশ্রাম আনন্দপূর্ণ না হলে সে বিশ্রামের কোন অর্থ হয় না। দিনমানের অধিকাংশ সময় যাঁদের নীরস কর্তব্যপালনে ব্যয়িত হয় এবং শ্রমের অনুপাতে যাঁরা মাইনে পান সামান্য, তাঁদের সকলের বিশ্রামের বিরল মুহূর্তগুলি দুরূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বের আলোচনায় অতিবাহিত হবে এতটা বোধ করি আশা করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট তো আজ যাঁকে পান তাঁরই সামনে তাঁদের বহুবিজ্ঞাপিত পঞ্চ-বার্ষিক-পরিকল্পনার মানচিত্র মেলে ধরেন। কিন্তু তাঁরা সমস্যার এই দিকটি চিন্তা করে দেখেছেন বলে মনে হয় না। লোকে খাওয়া-পরার ভাবনায় অস্থির, আপিস-আর-বাড়ী বাড়ী-আর-আপিস করতেই প্রাণান্ত, এই ব্যস্ততা আর উৎকণ্ঠার ফাঁকে

তথাকথিত গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলির প্রতি মনোযোগ ক্ষেপণের তাঁদের সময় কোথায় ? তাঁদের সেই সামর্থ্যই বা অবশিষ্ট কই ? কাজেই অবধারিত-ভাবে তাঁরা চটুল তরল অসার আলোচনার দিকে ঝোঁকেন এবং ওইভাবে কালক্ষেপ করাকেই সময়ের সদ্ব্যয় মনে করেন। যদিও, বলাই বাহুল্য, ওটি সময়ের সদ্ব্যয় নয়, বিকৃত আনন্দের মত্ততাজনিত তাড়নায় সময়ের অপব্যবহার মাত্র।

কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে কেরানীদের বিদ্যার প্রশ্ন তুলবেন। কেরানীরা যা হয়েছেন বা হবেন তাঁদের বিদ্যায় তার বেশী কিছু হওয়া সম্ভব নয়—এইটেই বোধ করি এদের মনের কথা। একথা সবসময় যথার্থ নয়। কেরানীদের মধ্যে যেমন স্বল্পবিদ্যা ব্যক্তি অনেক আছেন তেমনি বিদ্বান ব্যক্তিরও অসদ্ভাব নেই। কিন্তু হলে হবে কি, মামুলি কলমচির কাজে বিদ্যার কী মূল্য! আর মূল্য থাকলেও কেই বা তার স্বীকৃতি দেয় ? ফলে একটানা কয়েক বৎসর কলম চালাতে চালাতে বিদ্যার ধার ভোঁতা হয়ে আসে, শিক্ষার উৎসাহে মরচে ধরে। কেরানীশালায় বিদ্বান-অবিদ্বান সকলেরই শেষ পর্যন্ত এক গতি হয়, জীবন এসে ঠেকে কলমের ভোঁতা মুখে।

সদাগরী আপিসের কেরানীকুলের মধ্যে অবশ্য বিদ্যার তেমন প্রচলন নেই, সেখানে সে আবশ্যকতাও কেউ বোধ করে না। সদাগরী নিয়োগ-কর্তাদের ধারণা, কেরানীর কাজে বিদ্যার প্রয়োজন বাহুল্য; চোখ বুজে নকলনবিশি করতে পারাটাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। তথাকথিক মাছিমারা কেরানী হল তাঁদের বিচারে আদর্শ কেরানী। বিশেষতঃ ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের মধ্যে এ ভাবটি যেন একটু বেশী রকমেই প্রবল। তাঁরা তাঁদের এ দেশীয় আপিস পরিচালনার জন্য 'হোম' থেকে যে-সব ছোকরা অফিসার বা কেরানী ধরে নিয়ে আসেন, প্রায়শ লেখা-

পড়ার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছুটু। ফ্যাসান-দোরস্ত আচরণ কিংবা হুকুমজারীর ক্ষিপ্রতায় যে যত বেশী কৃতী, অফিসিয়াল রেকর্ডে তাঁর সুনাম তত বেশী। বিলিতি কর্মচারীরা আর-কিছু পারুক আর না পারুক 'তম্বি' দেখাতে ভালো করেই জানে। আর তাঁদের এ দেশীয় কেরানীদের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি যাই হোক তাঁদের হাঁকডাক বড় ফট্টাই আদৌ নেই। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা সেই-সব ব্যক্তিকেই তাঁদের কাজে পেতে ইচ্ছা করেন, যাঁদের বিদ্যা থাক্ বা না থাক্, 'লয়ালটি' সম্বন্ধে অন্ততঃ যেন কোনরূপ সন্দেহের কারণ উপস্থিত না হয়। ফলে যাঁদের পূর্বাপর ইতিবৃত্তান্ত নিয়োগকর্তারা সম্যক অবগত এবং যাঁদের আনুগত্য সংশয়াতীত, তাঁরাই সাধারণতঃ বিদেশী আপিসগুলিতে কেরানীরূপে আবির্ভূত হন। বিলিতি সায়েবদের নিয়োগপত্র জানিত মহলের বাইরে কদাচ যায়। চাকুরির ক্ষেত্রে বংশ-পরম্পরার রেওয়াজ তাঁরা স্বীকার ও অনুসরণের পক্ষপাতী, কেন না ওইভাবেই তাঁরা কর্মীদের আনুগত্য সব চাইতে ভালভাবে আদায় করতে পারেন। লোকে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, বিলিতি সদাগরী আপিসে চাকুরিও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য। বৃদ্ধ কেরানীর কার্যকাল অন্তে তস্য পুত্র, পুত্রের কার্যসমাপ্তি শেষে তস্য পুত্র—এইভাবে চাকুরির ক্ষেত্রে পারিবারিক মৌরসীপাট্টার একটা সুনিশ্চিত ধারা চলে এসেছে এই সকল আপিসে। নূতন কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, জানিত কোন কর্মচারীর ছেলে বা ভাইপো হতে পারাটাই তাঁর সেরা যোগ্যতা। ক্লাস সিক্স-সেভেনের বিদ্যে নিয়ে কত ছেলে যে এভাবে চাকুরি-বৈতরণী উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার সীমাসংখ্যা নেই।

তবে, যোগ্যতায় কী বা এসে যায়। বিদ্যার দিকে কমতি থাকলেই তো আর কোন মানুষ খারাপ হয়ে যায় না। মানুষ ভালো হওয়াটাই সংসারে আসল কথা, তারপর আর সবকিছু। চাকুরির ক্ষেত্রে বেতনবৃদ্ধি,

প্রমোশন ইত্যাদি নিয়ে যেমন সর্বত্রই ঈর্ষা বিদ্বেষ চিত্তদাহ আছে, কেরানীদের বেলায় তা থাকবে না এমন মনে করবার হেতু নেই। তবে এরই মধ্যে তাঁরা আশ্চর্য ভ্রাতৃবৎসল, সহযোগী, একতাবদ্ধ, জীবনপ্রীতি-সম্পন্ন, আমোদপরায়ণ। প্রবীণ কেরানীরা অনুজপ্রতিম তরুণ কেরানীদের ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখেও দেখেন না। বরং অনেক সময় তাঁরা জুনিয়র সহকর্মীর আমোদপরায়ণতায় জ্ঞানতঃ সহায়তা করে থাকেন। ছোকরা কেরানী যখন আপিস ফাঁকী দিয়ে ময়দানে জরুরী চ্যারিটি ম্যাচ দেখতে যায়, কিংবা নূতন কোন ছবির ম্যাটিনি-শোয়ে 'কিউতে' গিয়ে দাঁড়ায়, তাঁর সে অনুপস্থিতি বড়রা অনুমোদন করেন না এমন কথা জোর করে কেউ বলতে পারে না। চেয়ারের পিঠে চাদর বেঁধে সেই-যে আপিস-ফাঁকী দেওয়ার গল্প প্রচলিত আছে, সহকর্মীদের সহযোগ ছাড়া সেটি কোনক্রমেই সংঘটিত হতে পারে না, তা অনায়াসেই অনুমান করা চলে।

প্রবীণ কেরানীরা জুনিয়রদের আমোদপ্রিয়তা সস্নেহ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তাই বলে নিজেরা আমোদপ্রয়াসী নন। তাঁদের অধিকাংশের আমোদের বয়স কেটে গেছে, যদিও কেউ কেউ বৃদ্ধ বয়স অবধি মানসিক সজীবতা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন (শেষোক্তদের ময়দানে জলশায় বৈঠকে মিটিংএ আপনি হামেসাই দেখতে পাবেন)। বেশীর ভাগেরই এখন কন্যাদায় দ্বারা, পুত্রের শিক্ষার বা কর্মসংস্থানের সমস্যার দ্বারা, সংসারের আরও পাঁচটা ঝামেলার দ্বারা বিব্রত হবার পালা। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিব্রত। কারও ডায়বেটিসের ধাত, কেউ ডিস্‌পেপসিয়ায় ভুগছেন। ডিস্‌পেপসিয়ার রোগীর চেহারা শীর্ণ, মেজাজ অকারণ তিরিক্ষি। সহকর্মীদের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া করেন। তাই বলে তিনি কিছু মন্দ লোক নন। ওপরওয়ালার সঙ্গে সবার হয়ে লড়তে তিনিই আবার সব-আগে এগিয়ে আসেন। খাদ্যাখাদ্য ব্যাপারে বড় খুঁতখুঁতে।

দোকানের খাবার কিছুতেই ছোঁবেন না। পকেটে তাঁর নিদেন দু জোড়া পাতিলেবু সব সময় মোতায়েন থাকে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরবার পথে বৈঠকখানা বাজার থেকে তিনি এগুলি বিশেষ দেখেশুনে সংগ্রহ করেন। সহকর্মীদের মধ্যে হাতে যাঁরা ইলিশ মাছ কিংবা সদ্য-ওঠা গলদা চিংড়ি ঝুলিয়ে সোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁদের তিনি মনে মনে ঈর্ষা করেন কিনা বলা শক্ত।

ওস্তাদ

কলকাতার সঙ্গীত জগতে নানা শ্রেণীর লোক আছে। কেউ রবীন্দ্র-সঙ্গীতকার, কেউ আধুনিক সঙ্গীতনিষ্ঠ, কেউ লোকসঙ্গীত-কলারসিক, কেউ ঠুংরী ভজন গজল নাত্ গীত ইত্যাদি বিশেষ ধরনের গানে পারদর্শী, আবার কেউ বা ধ্রুপদ খ্যাল বর্গীয় উচ্চাঙ্গ ক্লাসিকাল সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ শিল্পী। শেষোক্ত শিল্পীদের মধ্যে আবার দুই জাত আছে: শৌখীন গাইয়ে-বাজিয়ের দল, এবং পেশাদার ওস্তাদের দল। এই পেশাদার ওস্তাদের সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলব।

পেশাদার ওস্তাদ শ্রেণীর মানুষদের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এঁদের ধরনধারণ করণকারণ সব আলাদা। অন্যান্য বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের পিঠে এ দের আচরণের পার্থক্য সুপরিস্ফুট। এঁরা একটা স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, এঁদের ধ্যানধারণা বিশ্বাসগুলিও তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। সাধারণতঃ পেশাদার ওস্তাদদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক দেখতে পাওয়া যায়, তবে মুসলমান ওস্তাদেরই সংখ্যাধিক্য। শেষোক্তদের মধ্যে বাঙালী কম, অবাঙালী বেশী। উত্তর ভারতের শিল্পীরা রুজিরোজগারের ধান্দায় বাংলা দেশে হামেসাই এসে ভীড় জমান; এমন কি সুদুর বোম্বাই, গুজরাট থেকেও ভাগ্যান্বেষী শিল্পীদের আসতে দেখা যায়। এঁদের পক্ষে কলকাতা উপার্জনের মস্ত একটা ক্ষেত্র।

বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ দিন দিন বাড়ছে। এবং যে অনুপাতে এই অনুরাগ বর্ধমান সেই অনুপাতে শিল্পীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পোষকতা নির্দিষ্ট শ্রেণীর

মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; রাজা মহারাজা ভূস্বামী শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আনুকূল্য করতেন। এঁদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ দরবারে ওস্তাদ পুষতেন এবং এই ওস্তাদপোষণ আভিজাত্যের একটি কৌলিক লক্ষণ হিসাবে গণ্য ছিল। হালে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ক্লাসিকাল সঙ্গীতের অনুশীলন আর নবাব-দরবার কিংবা ভূস্বামীর দরদালানের চতুঃসীমার ভিতর আবদ্ধ নেই, বিবর্তনের স্তর বেয়ে তা জনজীবনের উদার আঙিনায় নেমে এসেছে। লৌকিক জীবনের মধ্যে উচ্চ সঙ্গীতের প্রচার ক্রমব্যাপ্ত হওয়ার ফলে জাতির সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য পুষ্ট হয়েছে, শাস্ত্রশাসিত কৃত্রিম সংযমবন্ধন থেকে সঙ্গীতের মুক্তি আসন্ন হয়েছে। সাধারণ মেহনতী মানুষের কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন তাঁদের নিকট এই পরিবর্তন বাঞ্ছিত মনে না হয়ে পারে না।

ক্লাসিকাল সঙ্গীতের এই সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক প্রবণতার মুখে ওস্তাদদের মনোভাবেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। আগে এঁরা নবাব জমিদার-দের সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর ছিলেন; এখন এরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, নবাব জমিদারদের সে দিন আর নেই, ভারতীয় সমাজ-জীবন থেকে এঁদের পোটলা পুঁটুলি গুটিয়ে বিদায় নেবার সময় হয়েছে। ফলে এঁদের আনুগত্য স্থানান্তরিত হয়েছে। খারিজ রাজা-মহারাজা নবাব কিংবা বিদায়ী জমিদারদের অযথা মনোরঞ্জনের চেষ্টা না করে অধিকাংশ ওস্তাদই আজ জনসাধারণের তুষ্টিসাধনে যত্নবান। এঁদের রুজিরোজগার আজ-কাল বহুলাংশে জনসাধারণের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, কাজেই নিতান্ত বোধ্য অর্থনৈতিক কারণে জনগণের মনোরঞ্জন না করলে আর চলে না। বনেদিয়ানার মোহ ছেড়ে জনজীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার সাধনা ইতিমধ্যে পুরাদস্তুর শুরু হয়ে গেছে।

পেশাদার ওস্তাদের সঞ্চরণের ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়েছে তার একটা

প্রমাণ, দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে মিউজিক কন্‌ফারেন্স, জলসা ইত্যাদির আধিক্য। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণই এইসব অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। এর সঙ্গে রেডিওর ক্লাসিকাল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান-সূচী (ন্যাশনাল প্রোগ্রাম) যুক্ত হয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে জনজীবনের স্তরে নামিয়ে আনতে আরও খানিকটা সহায়তা করেছে। কলকাতায় মিউজিক কন্‌ফারেন্স হলে আজকাল আর অনুষ্ঠান-গৃহে তিল ধারণের স্থান থাকে না। যদিও টিকিটের অত্যন্ত অসঙ্গত উচ্চ হার হেতু জনসাধারণের অনেককেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় এবং অব্যাপারের ব্যাপারী সঙ্গীত-অসংশ্লিষ্ট ধনিক বণিক ব্যাপারীরা শুদ্ধমাত্র ট্যাঁকের জোরে তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করে বসে থাকেন, তা হলেও এরই মধ্যে সাধারণের জন্য যতটুকু সুযোগ অবারিত হয়েছে তাকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা চলে না। আর কিছু না হোক, জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় শ্রোতারা অনুষ্ঠান-গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে, কিংবা রেডিও-রীলের মারফৎ কিংবা প্রাইভেট জলসায় বিশিষ্ট ওস্তাদদের পরিবেশিত সঙ্গীতসুধা পান করতে পারে, সেটাই বা কী কম! অবস্থাটিকে পুরাপুরি সন্তোষজনক বলা চলে না যদিও, তৎসত্ত্বে এইসব অসুবিধার মধ্য দিয়েই জনগণকে ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে হবে। এবং একদিন এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবেই। ইচ্ছা যেখানে আন্তরিক সেখানে কোন বাধাই বাধা নয়।

ইচ্ছার আন্তরিকতার প্রমাণ পাই যখন দেখি সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাও আজকাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষামানসে ওস্তাদ নিয়োগ করতে শুরু করেছেন। এইসব সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ চাকুরীজীবী কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কেউ ছাত্র কেউ আর কিছু। অবসরকাল অযথা নষ্ট অথবা তুচ্ছ আমোদে নষ্ট করার বদলে এঁরা যে সেই সময় একটা মহান

শিল্পকলার অনুশীলনে নিয়োজিত করছেন তাতে জাতির সাঙ্গীতিক অগ্রগতি সম্পর্কে মনে আশার সঞ্চার হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্যই প্রয়োজন হয়, সঙ্গীতের লৌকিক আর আঞ্চলিক শাখাগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যও এটা দরকার। বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হলে ধ্রুপদ খ্যাল টপ্পা ইত্যাদির বিচিত্র সম্ভাব্যতা নানা দিক দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মার্গ সঙ্গীত চর্চার সুফলকে বাংলা গানের পরিপুষ্টি বিধানে প্রয়োগ করতে হবে। বাংলা গানের নিজস্ব কল্যাণের বোধ থেকেই এই ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসর হওয়ার গরজ আসা দরকার। গাঁথুনি যদি পাকা না হয়, বাংলা গানের ইমারৎ দাঁড়াবে কিসের উপর ভর করে ?

এই কারণে ওস্তাদদের সঙ্গ বাংলা গানের অনুশীলনকারীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। ওস্তাদদের পক্ষেও এই যোগাযোগ সমূহ সুফলের কারক হবে বলে বিশ্বাস। বাংলা গান আর ওস্তাদী গান দুটি স্বতন্ত্র জগৎ—এই দুই জগতের বাসিন্দাদের পারস্পরিক জানাচেনার ফলে উভয় জগতের প্রভাবসীমাই সম্প্রসারিত হবে। বস্তুতঃ এরই মধ্যে সে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। উত্তর ভারতীয় ওস্তাদদের মধ্যে অধিকাংশ অনক্ষর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের শিল্পবোধ অসাধারণ। সঙ্গীতকে কণ্ঠে বা যন্ত্রে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁদের দোসর খুঁজে পাওয়া ভার। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ওস্তাদদের সংরক্ষণশীল মনোভাবের জন্য তাঁদের প্রতি বিরূপ ছিলেন, কিন্তু তিনিও ওস্তাদদের এই বিশেষ কৃতিত্বের দিকটির উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। তা ছাড়া ওস্তাদরা শ্রেণী হিসাবে খুবই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। সঙ্গীতের ঘরানা, রাগ রাগিণীর কৌলীন্য, স্বরলিপির যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিষয়ে ওস্তাদদের মধ্যে কিছু কিছু অনুদারতার পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, তা বলে তাঁরা বাস্তব বুদ্ধি বিরহিত

যুগের সঙ্গে তাল নন। রেখে চলবার ক্ষমতা তাঁদের আছে। শিল্পীর ভূমিকায় তাঁরা শিল্পী, প্র্যাক্‌টিকাল মানুষের ভূমিকায় তাঁরা ঘোর প্র্যাকটিকাল মানুষ। তাঁদের প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি যে কথার কথা নয় তাঁদের আনুগত্যের দিক-পরিবর্তন থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জনজীবনের সঙ্গে তাঁদের একাত্ম হবার সাধনা বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা আর কুশলতামণ্ডিত।

তবু কারও কারও মনে হয়তো পুরাতন দিনের মোহ এখনও কিয়ৎ-পরিমাণে লেগে থাকতে পারে। সেই নবাব-ওমরাহের বেলোয়াড়ি ঝাড়লণ্ঠন শোভিত কক্ষের পাতা ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গান গাওয়া বা শোনা—সেদিন কি আর ফিরে আসবে! তখন পোশাকেরই বা কী বাহার ছিল। মাথায় চুমকি-বসানো শালুর পাগড়ি তার উপর বাহারে তাজ শোভমান, মেহেদিরঞ্জিত লাল দাড়ি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুই কানে আবদ্ধ, গায়ে তারা-ফোটানো মখমলের জোব্বা, তার নীচে জড়ির বুঁটিদার চুড়িদার ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে আঁটোসাঁটো পায়জামা, পায়ে খোলতাই নাগ্‌রা—এ বেশ কি আর এই গণতান্ত্রিক যুগে পরা যায়, না সেটা মানাবে? পুরাতনের মোহগ্রস্ত ওস্তাদ বিগত কালের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পারেন, কিন্তু তাঁর শত কামনাতেও ফেলে-আসা কাল আর ফিরে আসবে না, সে ইতিহাসের কবরের তলায় চাপা পড়ে গেছে।

অনেক উত্তর ভারতীয় ওস্তাদ আজ জীবিকাব্যপদেশে কলকাতাকে তাঁদের স্থায়ী কর্মস্থল করে নিয়েছেন। কারও কারও নিকট এই সহর স্বগৃহতুল্য হয়ে গেছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান বাঙালী অবাঙালী এইসব সঙ্কীর্ণ ভেদাত্মক চিন্তা কোনকালেই স্থান পায় নি, আজও পাচ্ছে না। জাতি হিসাবে আমরা যে বেঁচে আছি, মরি নি, এটা তার একটা মস্ত প্রমাণ। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সম্প্রীতির

সব চাইতে ফলদায়ক ক্ষেত্র যদি কিছু থেকে থাকে সে হচ্ছে শিল্পকলার ক্ষেত্র। এই দিক দিয়ে শিল্পকলার সমস্যাটিকে বিচার করলে জাতির বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা সহজতর হতে পারে। আমাদের ভিতর শিল্পবোধ যত উন্নত হবে, পারস্পরিক মৈত্রী ও শুভেচ্ছার এলাকাও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাংলা দেশে যে সকল উত্তর ভারতীয় ওস্তাদ কার্যরত ছিলেন, তাঁদের ভিতর ইমদাদ খাঁ, ককুভ খাঁ, মৈজুদ্দিন খাঁ, কেরামতুল্লা খাঁ, বাদল খাঁ, ছোটে খাঁ, মেহেদী হোসেন খাঁ, আস্‌ফাক হোসেন খাঁ, জমিরুদ্দীন খাঁ, এনায়েৎ খা, আমীর খাঁ (যন্ত্রী), গুল মামুদ খাঁ, কাদের বক্স প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীদের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানেও কলকাতায় ওস্তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এদের মধ্যে দবীর খাঁ, সগীর খাঁ, মসিদ খাঁ, কেরামৎ, বিলায়েৎ খাঁ, মুস্তাক আলি খা, আমীর খাঁ (গায়ক), এ কানন প্রভৃতির নাম সহজেই মনে পড়ে। দবীর খা রামপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ লোকান্তরিত উজীর খাঁ সাহেবের নাতি এবং তানসেন ঘরানার একজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ। মসিদ খাঁ অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া। বিলায়েৎ এনায়েৎ খাঁর পুত্র, সেতার বাদনে পিতার কৃতিত্বের যোগ্য উত্তরাধিকারী। কেরামৎ মসিদ খাঁর পুত্র, স্বয়ং কুশলী তবলাবাদক। মুস্তাক আলি খাঁ সেতারযন্ত্রের একজন নিপুণ শিল্পী। কণ্ঠসঙ্গীতে আমীর খাঁর তুল্য শিল্পী সহসা খুঁজে পাওয়া ভার।

বিগতের মধ্যে এনায়েৎ খাঁ ও বাদল খাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এনায়েৎ খাঁ ছিলেন যথার্থ সঙ্গীতসাধক, সুরে দিনরাত ডুবে থাকতেন। সেতারের এমন মধুর স্পষ্ট আওয়াজ আর কারও হাতেই আজ পর্যন্ত শোনা গেল না। গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)-এর জমিদারের আশ্রয়ে তিনি বহুকাল বাংলা দেশে ছিলেন। বাদল খাঁ ছিলেন দিলদরিয়া স্বভাবের

লোক—সঙ্গীতের একেবারে খাঁটি দেওয়ানা। তিনি ছিলেন মূলতঃ সারেঙ্গিয়া, তবে কণ্ঠেও তাঁর অধিকার ছিল বিস্ময়কর। কলিকাতার সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর নিকট কণ্ঠসঙ্গীতে 'তালিম' নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান পরলোকগত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীশচীন দাস (মতিলাল)। শতবর্ষজীবী বৃদ্ধ বাদল খাঁ সাহেবের আফিমের প্রতি একটু পক্ষপাত ছিল, শেষ বয়সে আফিমের মৌতাতে মাথাটা তাঁর সব সময় এক পাশে ঝুঁকে থাকত। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত, মুখ থেকে স্বর বেরোয় কি বেরোয় না। বৃদ্ধ বয়সে ওস্তাদমাত্রেরই অর্থাভাব যায়, তাঁরও গেছে, তবে যখন হাতে পয়সা আসত তিনি ছিলেন 'প্রিন্স'। শোনা যায়, একবার জনৈক সদ্যদীক্ষিত শিষ্যের কাছ থেকে 'নাড়া-বাঁধা' অনুষ্ঠানের বাবদে পাওয়া অর্থে প্রচুর খাদ্য কিনে রিক্সা চেপে সে খাদ্য রাস্তার দু ধারে বিলোতে বিলোতে তিনি তাঁর 'ডেরায়' গিয়ে পৌঁছেছিলেন। শিল্পীর খেয়াল একেই বলে।

উকিল

আমাদের ছোট বেলায় দেখেছি, শহরে যখনই নূতন কোন চতুর্থ ব্যক্তির সমাগত হত, অনুসন্ধানে প্রমাণ হত তিনি ওকালতি করবার মানসে শহরে পা দিয়েছেন। ওকালতি ব্যাবসার প্রারম্ভিক আয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অতি সামান্য। খড়ো-চালের একখানি বাহির ঘর যার মেঝের লেপা কাদা-মাটি এখনও শুকোয় নি (হয়তো ঘরের কোণায় দুর্বাঘাসও গজিয়ে থাকতে পারে), একখানি প্রমাণ-সাইজ পুরনো টেবিল, দুখানি হাতলহীন নড়বড়ে কাঠের কিংবা টিনের চেয়ার, একটা লম্বা টুল, আর একটি কাঁচভাঙা আলমারির ভিতর খানকতক আইনের বই—এই ছিল সৌভাগ্য ও যশোপ্রার্থী নতুন উকিলবাবুর ওকালতি ব্যবসায়ের সাকুল্য উপকরণ।

এই সামান্য আয়োজনের দ্বারা মক্কেলদের প্রলুব্ধ করা সত্যই একটু কঠিন, তবু সদ্য-কলেজ-প্রত্যাগত ছোকরা উকিলবাবুরা আশা করতে ছাড়তেন না। তাঁদের ভিতর অনেকেই স্বপ্ন দেখতেন, রাতারাতি তাঁরা কোন্-না বড়লোক হয়ে যাবেন. অন্ততঃ তাঁদের কেউ কেউ যে মনে মনে রাসবিহারী বসু কি টি এন্ পালিত কি সি আর দাশ-এর ন্যায় সফল ব্যবহারজীবি হবার আশা করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নামী ব্যক্তিরা ছিলেন ব্যারিষ্টার, আর এঁরা সব মফঃস্বল শহরের নিতান্ত হবু উকিলের দল, তা-ও পসার হয় কি না হয় তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। তবু এই সুগভীর ব্যবধানের চেতনা সত্ত্বে তাঁদের উচ্চাশা ছিল বিরাট, আর তা কোন কিছুতেই পোড় খেত না। আশা যদি করতেই হয় তো

বড় মাপের আশা করাই যুক্তিযুক্ত। তীর যদি ছুঁড়বেই, দূরের লক্ষ্যের অভিমুখে তীর ছোঁড়াই প্রশস্ত নয় কি ?

অন্যান্য জীবিকার আকর্ষণ পিছনে ফেলে রেখে সেই সময় অধিকাংশ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিই যে উকিল হবার দিকে ঝুঁকতেন তার একটা কারণ ছিল। প্রাক-স্বাধীনতা আমলে আমাদের দেশে উকিলের প্রতিপত্তি ছিল প্রচণ্ড। উকিলদের আর কোন গুণ থাক আর নাই থাক্ এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁদের সকলেরই রসনাসঞ্চালনপটুত্ব ছিল অসীম। ইংরেজীতে যাকে বলে 'গিফ্ট্ অব দি গ্যাব' সেই গুণপনার জোরে তাঁরা এক সময়ে দেশবাসীর কাঁধে চড়ে বেড়িয়েছেন। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, জনসেবা-প্রযাস, পৌর হিতসাধন প্রচেষ্টা— সর্বত্র উকীলদের গতিবিধি ছিল সমান অবারিত এবং তাঁদের প্রভাব ছিল অখণ্ড। উকিল শ্রেণীর কোনরূপ সহজাত গুণের কারণে যে এরকমটা হতে পেরেছে তা নয়, তাঁদের অভ্যাসমস্থণ রসনাসঞ্চালনক্ষমতাই এর প্রধান হেতু। আন্দোলন যে জাতীয়ই হোক-না কেন, সেটি করতে গেলে গলাবাজীর দরকার হয়, আর গলাবাজীতে উকিলের জুড়ি আর কে আছে? বক্তৃতা করতে, আরজির মুসাবিদা করতে, ডেপুটেশনের নেতৃত্ব করতে, কূটবুদ্ধি জোগাতে উকিলের তুল্য যোগ্য ব্যক্তি বাস্তবিক বিরল আর এই অবিসম্বাদী যোগ্যতাই তাঁকে এক সময় জনজীবনের কাজে অপরিহার্য করে তুলেছিল। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশ নেতাই ছিলেন উকিল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নেতৃত্বের শ্রেণীরূপ কেন এই বিশেষ আকার ধারণ করেছিল উপরের বিশ্লেষণ অনুসরণ করলেই তা অনুধাবন করা যাবে।

আরও একটি কারণ উকিলদের এই প্রাধান্যের মূলে সক্রিয় রয়েছে

মনে হয়। যাঁদের গভীর ভিতর চক্ষুলজ্জা আছে সে আর যে কাজেরই উপযুক্ত হোক, জনজীবনের অন্তর্নিহিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত। জনসেবায় আন্তরিকতা থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে গায়ের চামড়াও কিঞ্চিৎ পুরু হওয়া চাই। দুইয়ের তুলামূল্য বিচারে শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটিই সম্ভবতঃ সমধিক আবশ্যকীয় গুণ বলে পরিগণিত হবে। অনেকেই যে জনসেবার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে দ্বিধা করেন। তার কারণ তাঁদের আন্তরিকতার অভাব নয়—আন্তরিকতা তাঁদের পুরো মাত্রায়ই আছে—তার আসল কারণ, মান-অপমান বোধ বর্জন করবার মতো তাঁদের যথেষ্ট মানসিক শক্তি নাই। উকিলরা এই দিক থেকে বিশেষ গুণে গুণান্বিত। মানঅপমান বোধ লোকের কথা গায়ে মাথার অভ্যাস, তাঁরা অনেক কাল আগেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাঁদের সকলের মনের কথাটা যেন এই—

'বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো।
মারো আর ধরো পিঠে বেঁধেছি কুলো।'

নিষ্ঠার সঙ্গে ওকালতি করতে গেলে লজ্জাবোধ স্বরূপ মানসিক বিলাস প্রশ্রয় দিলে চলে না। বস্তুতঃ ওকালতি পেশাটাই এমন যে, এতে কিছুদিন লেগে থাকলে চক্ষুলজ্জারূপ মানবিক দুর্বলতা আপনা থেকেই ঝরে যেতে বাধ্য। এবং যে অনুপাতে মানুষের ভিতর চক্ষুলজ্জা কমে আসে তদনুপাতে মানুষের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়। আত্মপ্রত্যয় থেকে আসে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা, আর এই কামনার পরিতৃপ্তিতেই সাংসারিক জীবনের সার্থকতা।

উপরোক্ত মানদণ্ডের বিচারে বিগত যুগের উকীলরা যে সার্থকতম জীব ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

হালে অবশ্য উকীলদের পূর্বতন প্রতিষ্ঠা আর নাই। কী কুক্ষণে

দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর সেই সঙ্গে যেন দেশবাসীর মতিগতিরও পরিবর্তন হয়েছে। লোকে সহজে উকিলের পরামর্শ নিতে যায় না। জাতীয় আন্দোলনের যে অংশে বক্তৃতার স্থান ছিল প্রধান, সত্যকার কাজের স্থান ছিল গৌণ, সেই অংশে উকিলেরা স্বভাবতঃই আসর জাঁকিয়ে ছিলেন। সভা-সমিতি বৈঠক আদি আলোচনামূলক কাজে এবং পরিষদীয় বক্তৃতায় উকিলদের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদী। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং এ-সব আলোচনার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। অন্ততঃ যে আলোচনা বক্তৃতা নিতান্ত বিনাশমূলক, দেশের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তার আর বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। লোকে জননায়কদের মুখ থেকে গঠনমূলক কথাই আজকাল বিশেষ করে শুনতে চায়। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে উকিলদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই, সুতরাং পূর্বের তুলনায় স্বভঃই তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেছেন। যুগের ধর্ম অনুযায়ী নেতৃত্বের স্বরূপ বদলাতে বাধ্য, বর্তমানেও তাই হয়েছে। উকিল শ্রেণীর হাত থেকে নেতৃত্ব খসে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শ্রেণীর মানুষের উপর নেতৃত্বের দায় বর্তিয়েছে। পুরাতন দিনের ব্যস্তবাগীশ অনেক উকিলই আজকাল মনোমত কাজের অভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন।

এতে ক্ষতি ছিল না যদি উকিলদের আর্থিক সীমান্ত পূর্বের ন্যায় সুরক্ষিত থাকত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সেই সীমান্তের দেয়ালেও মস্ত বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ক্ষমতার দাপট অন্তর্হিত হওয়াটাই একটা প্রচণ্ড ক্ষতি, তার উপর যদি আবার আর্থিক ক্ষতিও মেনে নিতে হয় তবে আর সান্ত্বনার কোন হেতু অবশিষ্ট থাকে না। উকিলদেরও হয়েছে সেই দশা। লোকে কোথায় অশান্তি উপদ্রব ঘটিয়ে, মামলা-মোকদ্দমা বাধিয়ে তার প্রতিকারের আশায় উকিলের শরণাপন্ন হবে,

তা নয়, তারা আজকাল নিজেরাই বিবাদ-বিরোধের ফয়সালা করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ আদালতের দ্বারস্থ হয় না। দেশ যেন হঠাৎ অতিরিক্ত শান্তিপ্রিয় বনে গেছে। উকিলদের মধ্যে প্রকৃত যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাঁদের ধারণা, এ-সবই ঘটেছে গান্ধীজীর কুপরামর্শে। গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী সেই-যে গ্রামগুলিতে বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা চালু হতে শুরু করেছে, তারপর থেকেই উকিলদের ভাগ্যস্রোতে উল্টা টান আরম্ভ হয়েছে। আগে লোকে অতি সামান্য কলহ-বিবাদে আদালতের শরণাপন্ন হত, এখন হয়েছে উল্টো—জটিল বিবাদের মীমাংসাও সালিশ দিয়ে নিষ্পত্তি করিয়ে নিতে চায়। গ্রাম-প্রধান, বন্ধু-বান্ধব আর সালিশের হস্তক্ষেপের ফলে আদালতে মামলা-মোকদ্দমার পরিমাণ স্পষ্টতঃই অনেক গুণ কমে গেছে। মামলা-মোকদ্দমার পরিমাণ কমা মানেই উকিলের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়া। অস্বাস্থ্যের উপদ্রব যেমন ডাক্তারের সৌভাগ্যের কারক, তেমনি অশান্তির উপদ্রব উকিলের। যে পরিস্থিতিতে মানুষ দৃষ্টিগ্রাহ্য-ভাবে শান্তির আদর্শের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে সে অবস্থা উকিলের নিকট অস্বস্তিকর মনে না হয়ে পারে না।

সামাজিক শান্তিরক্ষার জন্য আইনবিধির প্রয়োজন হয়তো অপরিহার্য, কিন্তু আইনকে আশ্রয় করে যে জীবিকা গড়ে ওঠে তার প্রয়োজন ততখানি স্বতঃসিদ্ধ কিনা সন্দেহ। কারণ এটা তো অতি স্পষ্ট, ওকালতি ব্যবসায়ের মূল ভরসা হল মানুষে মানুষে বিরোধ। বিরোধভিত্তিক পেশা ভালো হতে পারে না। বহু বিত্তবান পরিবারের কথা জানি যারা দুই বিবদমান উকিলের পরামর্শে সর্বস্বান্ত হয়েছে। উকিলের সৌভাগ্যের মূলে বিরোধ-বিবাদের সংখ্যাধিক্য ও স্ফীতি। অশান্তির আবহাওয়াতেই উকিলেরা ফেঁপে ওঠেন। অবশ্য উকিলশ্রেণীর যারা সমাজের কিছুমাত্র

উপকার হয় না এ কথা বলব না, তবে অনর্থের তুলনায় সে উপকারের পরিমাণ সামান্য।

ওকালতি পেশার সব চাইতে অনিষ্টকর দিক, এ ব্যবসায়ে জেনেশুনে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মক্কেল অপরাধী জেনেও আইনের চক্ষে তাকে নিরপরাধ জ্ঞান করে তার হয়ে মোকদ্দমা চালিয়ে যেতে হয়। এ ছাড়া স্বমতের প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বপক্ষের জয়ের জন্য কারণে অকারণে কত যে মিথ্যা কথা বলতে হয় তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। মিথ্যার সঙ্গে যে ব্যবসায়ের এমন নিকট সম্পর্ক তা কখনও বাঞ্ছনীয় পেশা রূপে গণ্য হতে পারে না। আমাদের দেশের কিছু কিছু বিবেকী লোকেব কথা আমরা জানি যাঁরা আইনব্যবসায়ের মিথ্যাসর্বস্বতায় ক্লিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত সে পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এই ক্ষেত্রে অন্যতম সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। তিনি পূতচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং ওকালতি পেশার কলুষিত আবহাওয়ায় দুদিনেই তিনি হাঁফিয়ে উঠবেন এতে আর বিচিত্র কী। উকিল সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সদৃশ ব্যক্তির আবির্ভাব বিরল না হয়ে যদি নিয়মিত ঘটনা হত তা হলে দেশের চেহারা অন্যরকম হত।

আমোদতত্ত্ব ও প্রমোদসন্দেশ

পূজা সমাগতপ্রায়। এ সময় স্বভাবতঃই বাঙালীর মন একটু স্ফূর্তি-উন্মুখ হয়ে থাকে; সম্বৎসরের দায়িত্বের বোঝা ঘাড় থেকে সজোরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মনটা ক্ষণকালের জন্য হালকা খুশির অলস স্রোতের উপর দিয়ে পাল-তোলা নৌকোর মত ভেসে বেড়াতে চায়। মানুষ ভারবাহী পশুর মত সারাটা বছর শুধু বোঝা টেনে বেড়ায়, কিন্তু ভারবাহী পশুরও ক্লান্তি আছে। একটু ফাঁক পেলেই জোয়ালটা কাঁধ থেকে আলগা করে খানিকটা জিরিয়ে নেবার অবসর খোঁজে। তেমন সুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিরোয়; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমোয়।

শরৎকাল হচ্ছে এই জিরোবার আর ঝিমুনির কাল। মনটাকে কিছুকালের জন্য ছুটির আনন্দে ভরপূর করে তোলো, মজা লোটো, জিরোও ঝিমোও ঘুমোও—কেউ কিছু বলবার নেই। বলবার নেই কারণ তোমার পুচ্ছ মর্দন করে পেছন থেকে যাঁর পাচনকাঠি নিয়ে তাড়না করবার কথা তাঁরও তখন ছুটি। রুটির মালিক নিজেই তখন ছুটি লুটতে ব্যস্ত। সুতরাং কে কার খোঁজ রাখে?

শরৎকালটা হচ্ছে ঐতিহ্যগতভাবে উৎসবের কাল, ছুটির কাল। শরতে আকাশের পারাপারহীন সুনীল বিস্তারের উপর জলহারা শাদা মেঘের ভেলা হালকা দুলুনির ছন্দে ক্রমাগত এগিয়ে চলে, আর তা দেখে মনটা আপনা থেকে উড়ু উড়ু করতে থাকে। কথাটা যদিও স্কুলপাঠ্য শরৎকাল সম্বন্ধীয় রচনায় নিমতিতো করে বলার মত বারবার বলা হয়েছে তবু পুনরায় বলি, শরৎকালের সকালের রোদের মধ্যে যেন একটা সহজ খুশির রঙ মিশিয়ে আছে। শরতের সোনার-বরণ রোদ্দুর পূজার

অনেক আগে থেকেই মনের মধ্যে পূজার ভাবটি জাগিয়ে দিয়ে যায়। শুনেছি প্রাচীন রাজারা শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বেরোতেন। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয় না। দিগ্বিজয়ের নেশা রাজাদের একেবারে রক্তের মধ্যে। সেই নেশাটা শরৎকালের রোদ্দুরের স্পর্শে বিশেষভাবে চুল-বুল করে উঠবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রাজার রাজাগিরি বজাবার একটি প্রধান সহায় এবং অস্ত্র হল দিগ্বিজয়। যিনি যত বেশী দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পরের দেশ লুট করতে পারেন তিনি তত বড় দিগ্বিজয়ী বীর, তত প্রকাণ্ড রাজা। একটি জাপানী প্রবাদবাক্যের মর্ম হল এই, যে লোক সোনা চুরি করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়, আর যে লোক জমি চুরি করে তাকে বানানো হয় রাজা। রাজকুলের মধ্যে যিনি চোরশ্রেষ্ঠ তাঁরই অপর নাম 'রাজচক্রবর্তী'। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে রাজচক্রবর্তীর বিবিধ লক্ষণ দেওয়া আছে। তার একটি লক্ষণ হল রাজকুলের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজচক্রবর্তীর অধিষ্ঠান। অর্থাৎ লুণ্ঠন আর শোষণের চক্রান্তের যিনি মধ্যমণি তিনিই রাজকুলের মধ্যে 'চক্রবর্তী'।

যাক, কী কথায় কী কথা এসে গেল। কথা হচ্ছিল শরৎকাল নিয়ে। শরৎকালের উৎসব-প্রবণতা নিয়ে। চোরাবাজারী ব্যবসা ফাঁদতেও যেমন ব্যবসায়ীরা পাঁজি হাতড়ে শুভদিন দেখে ব্যবসায়ের পত্তন করে, তেমনি রাজারা তাঁদের দিগ্বিজয়ের অভিযানের জন্যও পাঁজির তথ্য অনুযায়ী শুভদিন খুঁজতেন। শরৎকাল হল সেই পাঁজি-নির্দিষ্ট শুভকাল।

অবশ্য একালে আর দিগ্বিজয়ে বেরোনো হয় না। যুগের রীতি-পদ্ধতি বদলেছে। একালের মানুষ আমরা শরৎকাল এলে হাওয়া বদলের দিগ্বিজয়ে বেরোই। ছুটিতে কেউ যাই পুরী, কেউ মধুপুর, কেউ দার্জিলিং, কেউ আর কোথাও। দিকে দিকে আমাদের ছুটির অভিযান চলে।

অবশ্য সকলেই যে ছুটির অভিযানে বেরোতে পারে এমন নয়। অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবানের দল ট্যাঁকের ক্ষীণতার প্রতি লক্ষ করে কর্মস্থলেই থেকে যেতে বাধ্য হয়। তারা আর-কিছু করবার না পেয়ে—সর্বজনীন দুর্গোৎসব করে। সর্বজনীন দুর্গোৎসব এমনই ব্যাপক বারোয়ারী একটি ব্যাপার যে, লোকের মুখে মুখে সেটি 'সার্বজনীন' দুর্গোৎসবে পরিণত হয়েছে। নিরাকারে আমাদের রুচি নেই, তাই সর্বজনীনকেও আকারমণ্ডিত করে সার্বজনীন বানিয়েছি। সাকার পূজায় আকার না থাকলে কি চলে ?

কলকাতা শহরে এই-যে অগণিত সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন হয় তাতে কী বোঝায় ? তা কি আমাদের আত্যন্তিক ধর্মভাবের পরিজ্ঞাপক ? না, নিছক আমোদপ্রবণতা তার ভিতরের কথা ? সর্বজনীন উৎসবের ধারণধরণ বিচার করলে শেষের অনুমানটাই সমধিক সত্য বলে মনে হয়। পূজা-উৎসবের অছিলায় সম্বৎসরের নিরুদ্ধ আমোদ-আহরণ প্রবৃত্তি বিশেষ একটি উপলক্ষে হঠাৎ বন্যার জলের মত ফুলে উঠে বিশেষ একটি খাতে প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়, তাই সর্বজনীন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে পাড়ায় পাড়ায় ছেলে বুড়ো জোয়ানদের এত উৎসাহ আর কোলাহল। আর এই আমোদ-প্রবণতার সঙ্গে মিশে থাকে খানিকটা বীরপূজা, মণ্ডপে মণ্ডপে নেতাজী সুভাষ বোসের মাল্যভূষিত ফোটো যার প্রমাণ। পূজা-উৎসবের আয়োজন-উপকরণের সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক তেমন স্পষ্ট নয়, তবু এইটেই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নেতৃশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য সুভাষ ধর্মানুষ্ঠানেরও প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছেন।

ছেলেদের অবশ্য এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। কেন না এইটেই স্বাভাবিক, এইটেই প্রত্যাশিত। কে না সুভাষ বোসের মত নেতা হতে চায় ? সর্বজনীন দুর্গোৎসব মণ্ডপে ছেলেদের 'ভলন্টিয়রির' নমুনাটা যদি একবার ভাল করে ঠাহর করেন তা হলেই বুঝতে পারবেন আমি কী

বলতে চাইছি। সব যেন মডেল সামনে রেখে ছোটখাটো এক একজন হবু নেতা হবার জন্ম উঠে-পড়ে লেগেছে। নেতৃত্বের বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করবার ব্যাপারে কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে তার জন্ম পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার অন্ত নেই। আরে বাপ্‌স্! জনতা নিয়ন্ত্রণের নামে সে কী মিলিটারী মেজাজ! বেচারা দর্শকদের এমনিতেই তো ভিড়ের চোটে ভির্মি খাবার উপক্রম, তার উপর হবু-নেতাদের অতি-হিতৈষণার দাপট! প্রাণ নিয়ে যে বেচারারা ঘরে ফিরে আসতে পারে সেইটেই এক-এক সময় তাজ্জব মনে হয়।

ভাবছেন ছেলে-ছোকরাদের বীরপূজা আর নেতৃত্ব-প্রয়াস নিয়ে এখানে আমি মস্করা করছি। আজ্ঞে না, আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে আজকের দিনেও ছেলেদের ঘাঁটাতে সাহস করব? বিশেষ করে কলকাতা শহরের সমিতি আর ক্লাব-উৎসাহী সর্বজনীনওয়ালা ছেলেদের? কলকাতার সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের অভিজ্ঞতার পর বেঘোরে প্রাণ দেবার ইচ্ছা কারও থাকতে পারে না, আমারও নেই। এখানে আমোদের তত্ত্ব ফেঁদে বসেছি, ছেলে-ছোকরাদের আমোদ প্রবণতা নিয়ে আমোদের ছলে দু চারটে কথা লিপিবদ্ধ করলুম মাত্র।

কলকাতার পূজার আমোদের আরেকটি প্রধান উপকরণ হল সিনেমা আর থিয়েটার। এই সময় সিনেমা আর থিয়েটারগৃহগুলি স্বভাবতঃই বৎসরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে সরগরম হয়ে ওঠে। সিনেমায় নূতন নূতন ছবি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষ করে বাংলা সিনেমা আর থিয়েটারগৃহগুলি সম্বৎসরের শৈথিল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ মাত্রাতিরিক্তভাবে সজীব হয়ে উঠবার চেষ্টা করে। থিয়েটারগৃহগুলির মেঝেতে ঝাঁট পড়ে (গোটা বৎসর যা পড়ে বলে মনে হয় না), দুই একটা 'সিন' পাল্টানো হয়, টুটা-ফুটাগুলিকে জোড়া-তাড়া দিয়ে কাজ-

চালানো-গোছের করে তোলা হয়, হাতল আর তলাশূন্য আসনগুলিকে লোকচক্ষুর অগোচরে সরিয়ে ফেলে দুই চারিটি সুদৃশ্য নূতন আসনের আমদানী করা হয় এবং এমনিধারা আরও কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন। নাট্যজগতের যাঁরা সম্রাট, যাঁরা একাধারে প্রযোজক পরিচালক নাট্যকার এবং প্রধান অভিনেতা, তাঁরা এই সুযোগগুলি ছাড়েন না, হয় 'তাম্রলিপ্তজয়' 'গজাসুরবধ' জাতীয় নূতন কোন নাটক মঞ্চস্থ করার সঙ্কল্প করেন, নয়তো শত-রজনী অভিনয়ের গৌরবসমন্বিত কোন জনপ্রিয় নাটককে পুরাতন গাদা থেকে টেনে বার করে ঝেড়েঝুড়ে তার পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

কলকাতার থিয়েটারগুলিতে সচরাচর যাঁরা গতায়াত করেন তাঁদের চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কালেভদ্রে যাঁরা থিয়েটারে যান, নেহাৎ শিশির ভাদুড়ী মশাই মঞ্চাবতীর্ণ না হলে নাটক যাঁদের মনঃপূত হয় না, সেইসব ঝড়তি-পড়তি দর্শকদের সঙ্গে এঁদের নানাদিক থেকে অমিল। এঁরা প্রায়শ প্রবীণ বয়স্ক, কেউ কেউ বৃদ্ধ, কিন্তু সকলেই ব্যতিক্রমহীন-ভাবে শৌখীন। বয়সে বুড়িয়ে গেলেও মনের তারুণ্য পাকেচক্রে বজায় রাখবার জন্যে এঁদের আয়াস প্রত্যক্ষ করলে হাসিও পায়, মনের ভিতর ব্যথাবোধও জাগে। গায়ে গিলে-করা অতি ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে নক্সাপাড় বাহারে তাঁতের কাপড়, পায়ে প্রজাপতি পাম্পসু, পাকানো চাদরখানি চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের ছবির ধরনে পাঞ্জাবীর উপর দিয়ে কায়দা করে জড়ানো, দশ-আনা ছ-আনা চুলে কলপের প্রলেপ, হাতে বকলস্ মার্কা ব্যাণ্ডযুক্ত কব্জিঘড়ি, আঙুলে একাধিক আঙটি, আতর আর এসেন্সে ভুরভুর—এই হচ্ছে কলকাতার থিয়েটার-যানেওয়ালা প্রবীণ দর্শকের typical চেহারা। এই শ্রেণীর দর্শক এখনও অর্ধেন্দু মুস্তফি আর দানিবাবুর অভিনয় স্মরণ করে সকাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, অমর দত্ত

আর কুসুমকুমারীর নামোল্লেখ মাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন এবং শ্রীমতী সরযূবালার অভিনয় দেখে আজকের দিনে আপনি-আমি যতই কেন না প্রশংসামুখর হয়ে উঠি, আপনার-আমার কথার প্রতিবাদ না করে অথচ ঈষৎ অননুমোদনের ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে ওঠেন, নাঃ, তেমন অভিনয় আর কই হচ্ছে আজকাল! সেই যে জনার ভূমিকায় তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখেছিলুম সে যেন আজও মনে গেঁথে রয়েছে! তারপর শতমুখে ব্যাখ্যান করে স্বর্গতা তারাসুন্দরীর গল্প বলেন, তাঁর থিয়েটার প্রবেশের প্রথম যুগ থেকে তাঁর পরমহংস দেবের শরণ নিয়ে সর্বরিক্ত হওয়ার কাল পর্যন্ত।

যা বিগত হয়ে গেছে তার জন্যে এঁদের মনে মোহ প্রচুর, অথচ নূতন কালের আমোদের লোভটুকুও ছাড়তে নারাজ—এই হচ্ছে এঁদের চেহারা। যৌবন বয়স থেকে থিয়েটার দেখে দেখে এমনই অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে আজ সে অভ্যাস কাটানো শক্ত হয়ে উঠেছে। অনেকটা গতানুগতিক অভ্যাসের খাতিরেই থিয়েটার দেখা, তবু মাঝে মাঝে পুরনো কালের মোহময় স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হয়ে নূতন দেখার মধ্যেই যে পুরনো দেখার স্বাদগন্ধ এনে দেয় না সে কথা জোর করে বলা যায় না। মানুষ খুব কমই নূতন সুখের প্রত্যাশী হয়। বাল্য বয়সে অথবা জীবনের কোন এক বয়সে—বাল্য বয়সেই বেশী—যে সুখ সে ভোগ করেছে সে সুখ সে নূতন করে ফিরে পেতে চায়। পুরাতন সুখানুভূতির সঙ্গে যে রোমাঞ্চ এক হয়ে মিশে ছিল নূতন অনুভবের বিষয়ের মধ্যে সেই পুরাতন রোমাঞ্চের স্বাদই সে ঘুরে ফিরে পুনরায় আহরণ করতে চায়। এজন্য তার মনে আকুলি-বিকুলির অন্ত থাকে না। এই রোমন্থনধর্মী আকুলি-বিকুলিটাকেই লোকে সাধারণতঃ সুখান্বেষণ নাম দিয়ে থাকে। কলকাতার পুরাতন আমলের নাট্যামোদীদের মধ্যে যারা আজও নিয়মিত

থিয়েটারে যাওয়ার অভ্যাস ছাড়েন নি তাঁরা প্রধানতঃ এই অতীতাশ্রয়ী সুখান্বেষণ প্রবৃত্তির বশেই সে কাজ করে থাকেন।

কিন্তু সিনেমা-দর্শকদের রকম সকম আলাদা। সিনেমা-রাজ্যে প্রবীণের ভিড় কম, নবীনের সংখ্যা সেই অনুপাতে অনেক বেশী স্ফীত। সিনেমা হচ্ছে মুখ্যতঃ বালক-বালিকা তরুণ-তরুণীদের এলাকা; এখানে গত দিন স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ বড় একটা নেই, যদিও নির্বাক আমলের স্মৃতি সিনেমা দর্শকদের একাংশের মনে আজও অমোচনীয় সুখস্মৃতি হয়ে আছে। স্কুলের ছেলে-ছোকরা, কলেজ-পড়ুয়া তরুণ-তরুণী, যুবক এবং প্রায়-প্রৌঢ় কেরাণীর দল—এঁরাই হচ্ছে প্রধানতঃ বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষক। আর আছে শহরের চালচুলোবর্জিত, সেই কারণে বিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ, অজ্ঞাতকুলশীল জনতার তরুণ অংশের আমোদ-বিলাসী প্রতিনিধিবৃন্দ—ছোকরা বিড়ি-মজুর, জুতো-পালিশ, চায়ের দোকানের 'বয়', হকার, বেকার ইত্যাদি। ফরাসী বিপ্লব কালীন প্যারিস শহরের স্যাঁৎসকুলৎদের তলানির বাঙালী সংস্করণ। দশ আনার টিকিটের 'কিউ'তে যারা ভিড় করে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে এ জাতীয় দর্শনার্থীর সংখ্যাই বেশী, যদিও জল-খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সিনেমা-দেখা ছোকরা দর্শকের সংখ্যাও বড় কম নয়।

কলকাতার বাংলা ছবির বাজার সরগরম করে রেখেছে প্রধানতঃ এই শ্রেণীর দর্শকরাই। ছবি 'চালু' হবে কি 'মার' খাবে সেটা নির্ভর করছে এদের মতামতের উপর। এরা মুখে মুখে ছবির তথাকথিত গুণাগুণ সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য ছড়িয়ে বেড়ায় সেগুলি আকাশে-বাতাসে ভাসতে থাকে, আর তারই উপর নির্ভর করে ভাবী দর্শকের দল স্থির করে এই ছবিটা দেখব কি ওই ছবিটা দেখব। সিনেমার সমালোচকবৃন্দও (তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ

করবার বেলায়) এদের মতামতটাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে থাকেন। ও হরি, আপনারা বুঝি জানেন না? সিনেমা-সমালোচক-দের বুঝি আপনারা সর্বজ্ঞ বলে ধরে নিয়েছেন? বলিহারি আপনা-দের! এটা নিশ্চিন্ত জানবেন আপনার-আমার মত সিনেমা-সমালোচকেরও বিচারবুদ্ধির (এবং বিদ্যার) উৎস হল ওই কী বলে চায়ের দোকান আর র‍্যাশন-দোকানের 'কিউ'। আপনার-আমার মত তাঁরাও সেখান থেকেই তাঁদের মতামত সংগ্রহ করে থাকেন, তবে তফাতের মধ্যে এই যে, আমাদের মতামত মুখেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাঁরা সেটাকে কাগজের পৃষ্ঠায় 'আমাদের সুচিন্তিত অভিমত' আখ্যা দিয়ে ফলাও করে ছাপেন।

পূজার ডামাডোলের সুযোগেই বাংলা ছবির বাজার সব চাইতে বেশী সরগরম হয়, সে কথা বলেছি। চিত্র-নির্মাতারা সারা বৎসর এই সময়টির দিকে উন্মুখ প্রত্যাশায় চেয়ে থাকেন এবং পূজা এলে তাঁদের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে (তাঁদের বিবেচনায়) বাজারে ছাড়েন। জনতা আকর্ষণের এইটেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাল। শরৎকালের সোনা-রঙ রোদ আর পূজার ছুটি-ছুটি ভাব দর্শকের খুঁটিয়ে বিচার করার প্রবৃত্তিকে ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ স্তিমিত করে রাখে। সেই অবসরে দর্শকদের যা-কিছু গেলানো যায় তাই তারা অমৃতবৎ গ্রহণ করে। আর দর্শকের বিচারবুদ্ধিই বা কী। সেই তো পরের মুখে ঝাল খেয়ে উঃ আঃ করা। অর্থাৎ 'আপ্-রুচি'র বদলে 'পর্ রুচি' খানা। সিনেমা-দর্শকের নিজস্ব রুচি বা পছন্দ বলে কিছু নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মতামত নিয়ন্ত্রিত হয়, যে কথা একটু আগে বলেছি, চায়ের দোকান আর র‍্যাশন-শপের গালগল্পের দ্বারা। "নকল বাবু"? আরে ছোঃ, ও আবার একটা 'বই' হয়েছে নাকি। যাবেন না

মোশাই ওতে, দশ আনা পয়সাই তা'লে মাটি; তার চাইতে কৃত্তিকা সিনেমায় 'সুন্দরীর অভিমান' বইটি দেখে আসুন গে, হ্যাঁ একটা ছবির মত ছবি হয়েছে বটে! যেমন ফার্স্টোক্লাশ এ্যাক্টিং, তেমনি ফার্স্টোক্লাস গান! হ্যাঁ, সেই গানখানা, কী যেন কথাগুলি, অনলবালা কী চমৎকার গাইলে, মাইরি!' ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে আপনার মতামত নির্দিষ্ট হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্কল্পও। তার পরই এক সন্ধ্যায় শ্যালি গিন্নি 'বাল-বাচ্চা' সব মিলে দল বেঁধে কৃত্তিকা সিনেমায় 'সুন্দরীর অভিমান' বইখানা দেখে এলেন এবং এইটে লক্ষ করে চমৎকৃত হলেন যে, যার মতামতের উপর নির্ভর করে আপনি ছবিখানা দেখতে এসেছিলেন তার কথাই ঠিক, এমন ছবি আর হয় না। আপনি ছবিখানা দেখে এসে আপনার মতটা চালান করলেন আপনার দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, সেইটে আবার ছড়িয়ে গেল আরও দু'চার জনের মধ্যে, এইরূপে পালাক্রমে আরও, আরও লোকের মধ্যে। ব্যাস্, দেখতে দেখতে 'সুন্দরীর অভিমান' ছবিখানা গোটা কলকাতা শহরের মন জয় করে নিলে। 'সুন্দরীর অভিমান' সে বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে এ দেশের 'এ্যাকাডেমি এ্যাওয়ার্ড' অর্থাৎ তথাকথিত ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েসনের সর্বসম্মত প্রশংসার ছাড়পত্র লাভ করে ধন্য হল।

জনপ্রিয় ছবির রহস্য হল এই। রহস্যের চাবিকাঠিটি চিত্র-নির্মাতাদের হাতের মুঠোয়। তাঁরা দর্শকদের মতিগতির সন্ধান খুব ভালো করে রাখেন এবং এ দেশের দর্শকসাধারণ কোন্ ধাতুতে তৈরি তা-ও জানেন। চিত্রনির্মাতারা জনমত প্রভাবান্বিত করবার উদ্দেশ্যে যেমন ঢালাও হস্তে বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ করে থাকেন, তেমনি অন্য দুই চারিটি কৌশলও অবলম্বন করেন। তার একটি

কৌশল হল ভাড়া-করা প্রচারক ঠিক করে তাদের ইতস্ততঃ জনতার ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া। চায়ের দোকানের টেবিলে বসে কিংবা রেশনের 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছবির গুণগান করে তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি তৃতীয় ব্যক্তি যে মাইনে-করা প্রচারক নয় সে কথা জোর করে বলা শক্ত।

ভাবছেন লোকটা আমি 'সিনিক' প্রকৃতির তাই অকারণ লোকের ছিদ্র-অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি, পূজার আমোদ একটা ছল মাত্র। কিন্তু আপনাকেই বলি, লোকে 'সিনিক' হয় কি সাধে! দেখে দেখেই লোকে 'সিনিক' হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ধারা-ধরণ আর মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে তার যে জ্ঞান হয়—প্রায়ই সে জ্ঞান বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার সমবায় মাত্র—সেইটেই তাকে জীবনে অবিশ্বাসী আর নৈরাশ্যবাদী করে তোলে এবং কিছুতেই তার চিন্তা-ধারাকে স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হতে দেয় না। নইলে বাংলা ছবির দর্শকরা স্বীয় বিচারবুদ্ধি খাটালো কি পরের মুখে ঝাল খেল তাতে অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কিছু যায় আসে না। আমি নিজেকে সিনেমা-জগতের সহিত অসংশ্লিষ্ট বলে মনে করি। তবু যে সিনেমা-দর্শকদের রুচিহীনতা দৃষ্টে দুচার কথা না বলে পারলুম না সেইটে এইজন্য যে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে মানুষের আলস্য দেখলে স্থির থাকা শক্ত। যত প্রকার আলস্য আছে তার মধ্যে চিন্তার আলস্য সব সব চাইতে মারাত্মক। পরের উপর বরাত না দিয়ে লোকে যতদিন নিজের ভাবনা নিজে না ভাববে এবং নিজের রুচি-পছন্দ নিজে না স্থির করবে, ততদিন দেশের সত্যকার কল্যাণ নেই। বিখ্যাত লেখক সমারসেট ম'ম এক জায়গায় বলেছেন—

"One pays a better compliment to the object of one's admiration when one considers him with sense than when one surrenders oneself to him like a drunkard to his glass of gin."

অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কাউকে গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকটিত হয় বিচারবিরহিতভাবে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলে তা হতে পারে না। মদ্যপের মদ্যপাত্রের কাছে ধরা দেবার মতই এ আত্মসমর্পণ অশ্রদ্ধেয়। বাংলার সিনেমা দর্শকদের আত্মসমর্পণকেও কি এই পর্যায়ে ফেলা যায় না?

আমোদ-প্রমোদের আরেকটি উপকরণ হল গানের জলসা। কিন্তু শরৎকালে গানের জলসা তেমন যেন জুৎসই হয় না। ঢাকের বাদ্যির আড়ালে গানের মাধুর্য প্রায়শ ঢাকা পড়ে যায়। শরৎকালে গানের জলসা না জমবার বাস্তব কারণও বোধ করি একটা আছে। কারণটি শরতের হিম। গায়কের কণ্ঠ প্রায়ই হিম প্রভাবে পূজারতির বাদ্যের ভাঙা কাসির মত ঘ্যানঘ্যান্ আওয়াজ দিতে থাকে। শ্রোতার পক্ষে সেটা খুব সুখকর নয়। তবু গান-বাজনা যে একেবারে না হয় এমন নয়। শৌখীন ধনী-গৃহের সুসজ্জিত পূজামণ্ডপে শখের থিয়েটার হয়, পল্লী-অঞ্চলের কোন কোন বনেদী জমিদার-গৃহে অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী বাই-নাচ হয় (অভ্যাসটি আজকের দিনে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বললে চলে), শহরের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে দুই-চারিটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শহরে নবাগত আমোদ-বিলাসীদের দিকে চোখ রেখে, এবং দুই-চারিটি গানের জলসাও হয়। তবে যাকে বলে বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তা কখনও শরৎকালের আমোদের বড় উপকরণ নয়।

আর আছে রেডিও। সে তো বারোমাস লেগেই আছে। তার কূজন-গুঞ্জনের বিরাম নেই। তবে হ্যাঁ, রেডিও-ও বাদ যায় না; পূজা উপলক্ষে রেডিওর আমোদ-সূচীতে কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করেছি। মহালয়ার দিন থেকে এ বৈশিষ্ট্যের শুরু। প্রতি বৎসর রেডিওতে মহালয়ার ভোরে মাইকযোগে চণ্ডীপাঠ প্রচারিত হয়, সেটি বড়ই মনোগ্রাহী। সংস্কৃত স্তোত্রের আবৃত্তি এবং আবৃত্তিকারকের উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভোরে অর্ধজাগ্রত-অর্ধসুপ্ত চেতনার উপর যে মোহ বিস্তার করে তার তুলনা নেই। আমরা যাঁরা ছা-পোষা কেরাণী এবং সেই সুবাদে পল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দায়ে ঠেকে শহরে বাস করি,'সার্বজনীন' কিংবা অন্য কোন প্রকার পূজানুষ্ঠানের সঙ্গেই যাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, তাঁদের চোখে রেডিওর এই শ্রুতিসুখকর অনুষ্ঠানটি পূজা অনুষ্ঠানের প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতা রেডিওর প্রশংসা করবার সুযোগ রেডিও কর্তৃপক্ষ বড় একটা আমাদের দেন না। এই জন্য মাঝে মাঝে আত্মগ্লানি বোধ করি। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে মন খুলে প্রশংসা করতে বাধা নেই। রেডিওর মহালয়ার প্রোগ্রামের জন্য আমরা রেডিও কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতে স্ত্রী-স্বাধীনতা

আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার আপেক্ষিক অগ্রগতির নিদর্শন হিসাবে বর্তমানে সচরাচর এই যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীনা মহিলার সংখ্যা বেশী। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মহিলা সদস্য আছেন, বিদেশে মহিলা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আছেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-পরিষদ-গুলিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়, সরকারী কাজে এবং অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ জীবিকায় মহিলার সংখ্যা বর্ধমান, এবং অন্যান্য নানা দিক দিয়ে জাতীয় জীবনের উপর মহিলা-সম্প্রদায়ের প্রভাব ক্রমস্ফীত। বছর দুই আগে রাষ্ট্রপুঞ্জপরিষদের প্রেসিডেণ্ট পদের নির্বাচনে মতিলাল-দুহিতা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের জয়লাভ বহির্বিশ্বে ভারতের নারী জাতির মর্যাদা আরও কিছুটা বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এ সবই আমাদের নারী জাতির পক্ষে শ্লাঘার কথা, তবে এতে উল্লসিত হওয়া চলে কি না সন্দেহ। কেন না যদি দেখা যায় যে নারীর আত্মসমুন্নতির প্রয়াস নারী-সম্প্রদায়ের কেবল একটি মাত্র স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা সমগ্র নারী-সম্প্রদায়কে স্পর্শ করে নি, সে ক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তির অবকাশ নিতান্ত সংকুচিত হয়ে আসে। কার্যতঃ তা-ই দাঁড়িয়েছে। এ দেশে নারীর সমুন্নতি বলতে শুধু অভিজাত, ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নারীকুলের সমুন্নতিকেই বোঝায়। এখন পর্যন্ত সর্বস্তরের নারীর ভিতর এই সমুন্নতির ফল পরিব্যাপ্ত হয়নি। সাধারণ ঘরের মেয়েরা যে তিমিরে ছিল

সে-ই তিমিরেই আছে। সত্য বটে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা আজকাল ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ঘরের বাইরে পা দিয়েছেন, কিন্তু সেটি তাঁদের সমুন্নত অবস্থার নিশানা কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব মেয়ে অসহায়, জীবিকা নির্বাহের সমস্যার দ্বারা বিশেষ ভাবে পীড়িতা, পরিবারের পক্ষে অবলম্বন স্বরূপ। ঘরের বদ্ধ কোণ থেকে বেরিয়ে বহির্জগতের বিশালতর ক্ষেত্রে পা দিলেও এঁদের জীবনে আত্মবিকাশের সুযোগ সীমাবদ্ধ। আত্মরক্ষার প্রাণান্তকর সংগ্রামে এঁরা অহর্নিশ নিয়োজিত, সে-কারণ এঁদের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্তিহীন ও ম্লান। তা ছাড়া, পথে-ঘাটে আপিসে-আদালতে আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রেখে নিরাপদে চলবার সমস্যাও আছে। যে সমাজে অসহায় মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা পদে পদে খণ্ডিত ও বিড়ম্বিত, সে সমাজের মেয়েরা বাইরের পৃথিবীতে আপনার মর্যাদার স্থানটি অধিকার করে নিতে পেরেছেন এমন কথা বলা যায় না। বাহ্যিক লক্ষণাদি যে সব সময় যথার্থ অবস্থা পরিমাপের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয় এটি এখনকার মধ্য আর নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়েদের জীবন পর্যালোচনা করলে অনায়াসে বোঝা যায়।

সুতরাং সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় নারী সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি হয়েছে এ কথা প্রতীতিযোগ্য নয়। বিত্তবান সমাজের সুহৃৎ কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের আমলে যেমন ধনী সম্প্রদায়ের ছেলেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নানা রকম সুবিধা সুযোগ আদায় করে নিচ্ছেন, তেমনি সেই সমাজের কিছু সংখ্যক মেয়েরাও ভাইদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই প্রক্রিয়া খোদ্ নেহরু-পরিবার থেকে শুরু করে অন্যান্য আরও অনেক উচ্চবিত্ত পরিবারের ভিতর শিকড় বিস্তার করেছে। তারই ফলে

এ দেশের উঁচুতলার সমাজের মেয়েদের মধ্যে তথাকথিত জাগরণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, এ অবস্থা নারীজাতির ব্যাপক জাগরণের নির্ণায়ক নয়। কিংবা সেটা তাঁদের স্বাধীনতারও প্রতীক নয়। নারী-জাগরণ আজও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একটা কথার কথা হয়ে আছে।

নারীর অধিকার সম্প্রসারণের প্রশ্নে ভারতীয় মন কত রক্ষণশীল, হিন্দু কোড বিলের প্রসঙ্গে তার প্রমাণ মেলে। হিন্দু কোড বিল বহু দিন পরিষদীয় আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত হয়ে ঝুলে ছিল। আমাদের কংগ্রেস নেতৃবর্গের একটা মোটা অংশ পাকেচক্রে এই বিলটিকে ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। হিন্দু কোড বিলের প্রতি জওহরলালের সমর্থন সুবিদিত, কিন্তু তিনি তাঁর একার শক্তিতে এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলেন না। পরে অবশ্য প্রস্তাবের বৈপ্লবিক অংশটুকু সযত্নে ছাটাই করে কতকগুলি 'অনিষ্ট-সম্ভাবনাহীন ধারার আকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিলটিকে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে সার অংশটুকুই বর্জিত হয়েছে। হিন্দু-মহাসভাপন্থী রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধতার অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু কংগ্রেস স্বয়ং বিলের প্রবর্তক হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই বিলটির বিরুদ্ধাচরণ করল এটা বাস্তবিকই তাজ্জব ব্যাপার।

খতিয়ে দেখলে, এতে আশ্চর্য হবার বোধ করি কিছু নেই। পুরুষ-শাসিত ভারতীয় সমাজ নারীর অধিকার সম্প্রসারণের প্রশ্নে কোন সময়েই খুব বেশী উদার মনোভাবের দ্বারা চালিত হয় নি। বিশেষ, যেখানে অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত নিয়ে কথা, সেখানে পুরুষের শ্রেণীস্বার্থ তীব্র ভাবে অভিব্যক্ত। নারীর সম্পর্কে পুরুষ ততখানি পর্যন্ত উদার যে সীমার মধ্যে স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেও নারীকে দেবী বানানো যায়। কিন্তু যা-ই একটু অর্থনৈতিক অধিকারের পরিধি সংকুচিত হবার আশঙ্কা দেখা দিল, অমনি পুরুষ তার শ্রেণীস্বরূপ উদ্ঘাটিত করে নারীর আত্মোন্নয়নের

প্রয়াসকে বাধা দিল। এ জিনিস আমাদের দেশের ইতিহাসে বার বার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধাচরণে পুরনো অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিটাই প্রকট। এমন নয় যে হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সকলেই আধুনিক ভাবধারার সম্পর্কে অচেতন। এদের মধ্যে বিলাতফেরত ব্যারিস্টার ছিলেন—বস্তুতঃ কতিপয় ব্যারিস্টারই ছিলেন বিরোধী আন্দোলনের নেতা—, উচ্চ সরকারী কর্মচারী ছিলেন, কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন, সাংবাদিক ছিলেন, বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায়ের আরও কেউ কেউ ছিলেন। চিন্তা বা আচরণের ক্ষেত্রে প্রগতির মর্যাদা এঁরা না বোঝেন তা নয়, কিন্তু বলেছি তো, যেখানে আর্থিক স্বার্থহানির আশঙ্কা সেখানে অতি বড় উদার ব্যক্তির পক্ষেও নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ মনোভাবের পোষকতা করা কঠিন। স্বার্থহানির সুস্পষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও মানুষ যখন নীতিকে আঁকড়ে থাকেন মাত্র তখনই তাঁকে প্রকৃত আদর্শবাদী বলা যায়। ওই মানদণ্ডের বিচারে আদর্শবাদী ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে পুরুষ-সম্প্রদায়ের একটা মোটা অংশের আদর্শ যে বাস্তব পরীক্ষার ধোপে টেকে না সে তো অতি প্রত্যক্ষ।

নারী-সমাজ কতটা পরিমাণ স্বাধীন বা পরাধীন তা তার অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। এই-যে দেশের জনমতের একটা বিস্তৃত অংশ পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার অধিকার লাভের প্রশ্নে হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধাচারণ করল এতেই প্রমাণ, আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা কিছু গৌরব করে বলবার মত নয়। মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাধীনতারও বিস্তার ঘটে থাকে। এটা কি পুরুষ কি নারী সকলের সম্পর্কেই সমান সত্য। হিন্দু কোড বিলে যে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের সীমা সম্প্রসারণের প্রস্তাব

করা হয়েছিল তার অর্থ, পূর্বের তুলনায় নারীর স্বাধীনতা সমধিক সুরক্ষিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, এই চেষ্টার পিছনে পুরুষের যথোপযুক্ত সমর্থন নেই। নারীর অধিকারবিস্তৃতির প্রশ্নে পুরুষ-সমাজের উৎসাহহীনতা আজই প্রথম প্রকটিত হল তা নয়, ব্রিটিশ আমলে আরও কয়েক বার এ জাতীয় ব্যাপার ঘটেছে। রাজা রামমোহন রায় তাঁর সময়ে উপযুক্ত আইনের সাহায্যে স্ত্রীজাতির অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন। মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির একাংশের উপর স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু ওই একান্ত যুক্তিসঙ্গত নির্দোষ দাবীর সম্পর্কেও তৎকালীন দেশবাসীর মনোভাব অনমনীয় ছিল! নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতাকে শাশ্বত একটি ব্যবস্থা হিসাবে সমাজদেহে কায়েম করে রাখবার জন্য আমাদের পুরুষ সমাজের আকুলতা অসীম। পুরুষের তরফে এ আকুলতা পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে—পুরানো অবস্থার খুব বেশী ইতরবিশেষ হয়েছে বলে মনে হয় না।

নারীর অধিকাংশ দুর্গতির মূলে তার অর্থনৈতিক পরাধীনতা—এ কথা পুরুষ না বোঝে এমন নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মাথা এত এত ব্যাপারে এত ভাবে খেলে, আর এই সামান্য ব্যাপারটাই তাঁদের নজর এড়িয়ে যাবে তা হয় না। বরং এই বলাই বোধ করি যুক্তিযুক্ত যে, পুরুষ এ বিষয়ে সচেতন বলেই নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বিস্তৃতির আন্দোলন প্রতিরোধে আরও যত্নবান। তারা জেনেশুনেই অর্থনৈতিক সমুন্নতির ক্ষেত্রে নারীকে কোণঠাসা করে রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। অজ্ঞ প্রতিরোধ অপেক্ষা সচেতন প্রতিরোধ অনেক বেশী ফলপ্রদ, অনেক বেশী মারাত্মক।

সব চাইতে বেদনার, নারী সমাজের কিয়দংশ নিজেরাই নিজেদের

পায়ে কুড়ুল মারবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধতা পুরুষ সমাজের কাছ থেকে এসেছে তা-ই নয়, মেয়েদের একাংশের কাছ থেকেও এসেছে। আর আশ্চর্য এই যে, এই বিরুদ্ধবাদিনীদের প্রায় সকলেই তথাকথিত বড় ঘরের মেয়ে। হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধাচারী অনেক বড় বড় চাঁইএর সঙ্গে তাঁদের গৃহিণীরাও প্রতিরোধের সংগ্রামে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। আমাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থা কত অসহায় এ ঘটনা থেকে তার একটা প্রমাণ মেলে। নারীর অধিকার সম্প্রসারণ ও সুরক্ষিতকরণের জন্য যে বিলের অবতারণা, সেই বিলের বিরুদ্ধাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে কি না স্বয়ং নারী! জার আলেকজাণ্ডার রুশ সার্ফদের মুক্তিদানের প্রস্তাব করলে দাসত্বের আফিমের নেশায় আবিষ্টবুদ্ধি সার্ফসম্প্রদায়ের কতকাংশ সেই উদার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। আমাদের নারী সমাজের একাংশের সাম্প্রতিক আচরণের ভিতর সেই দাস্য মনোভাবেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। অথবা এমনও হতে পারে, আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী একান্তভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীলা বলেই এ জাতীয় বিসদৃশ ব্যাপার ঘটতে পেরেছে। ভারতীয় নারী প্রায় সর্ব ব্যাপারে পুরুষের করধৃতা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও। বিশেষ, নারী জাতির এই সর্বাঙ্গীণ পরাধীনতা তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীগুলির মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রকট। আরামস্বাচ্ছন্দ্যে যে নারী অভ্যস্তা, সে তার পুরুষপ্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে স্বতঃই ভয় পায়, আর বিলাসলালিতা নারীর এই ভীতিবিহ্বলতার সুযোগ নিতে পুরুষ কোনও সময়ে পশ্চাৎপদ নয়। উচ্চ সমাজের পুরুষ যেমন নারীকে প্রায়শ ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করে, তেমনি নারীও ঐশ্বর্যের মোহে পুরুষকে একান্তভাবে আশ্রয় করে থাকে। এই যেখানে অবস্থা,

সেখানে নারীর স্বাধীন ইচ্ছা খাটাবার সুযোগ খুবই সংকুচিত, এমন কি স্বীয় স্বার্থাদির ব্যাপারেও তাদের পুরুষের হাত-ধরা হয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। উঁচুতলার সমাজের মেয়েদের একাংশ হিন্দু কোড বিলের উপর কেন খড়্গহস্ত হয়েছিলেন উপরের বিশ্লেষণের মধ্যে তার ব্যাখ্যা নিহিত আছে বলে মনে করি।

মধ্য, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থাও যে উঁচুতলার সমাজের অবস্থা থেকে খুব বেশী ভিন্ন তা নয়। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, আর্থিক সাচ্ছল্যের কারণে উঁচুতলার জীবনে স্ত্রী-স্বাধীনতার একটা ঠাট—শুধুই ঠাট—খাড়া আছে; মধ্য, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারজীবনে সেই ঠাটটুকুও অনুপস্থিত। মধ্যবিত্ত সমাজ বৃত্তিজীবী সমাজ। এই সমাজের পুরুষেরা, যথা উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, আপিসপরিচালক, উঁচু-মাহিনার সাংবাদিক বা কেরাণী, ব্যাঙ্কের এজেণ্ট, এ্যাকাউণ্টেণ্ট বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা জীবিকা ও কর্মের লোক অর্থের আপেক্ষিক সচ্ছলতা হেতু দৃশ্যতঃ ঔদার্যের মনোভাব দ্বারা নিজেদের চালিত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেখানে মাতৃজাতির স্বাধীন ইচ্ছাকে মার্যদা দান নিয়ে কথা, সেখানে তাঁদের ঔদার্য বাস্তব পরীক্ষায় প্রায়শ অনুত্তীর্ণ। বাইরে যেমনই হোন, স্বীয় গৃহের আবেষ্টনীর ভিতর প্রত্যেকটি পুরুষই এক-একটি ক্ষুদে হিটলার। সেখানে মেয়েদের ব্যবহারে পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসবার যো নেই। নারীর প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি সামান্যতম গতিবিধি পুরুষের দ্বারা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত। প্রেমিকের ক্ষমাশীলতা সুবিদিত, কিন্তু আমাদের ভদ্র সমাজে নারীর দুর্বলতা কখনও পুরুষের ক্ষমা পায় কি না সন্দেহ। পুরুষের পদস্খলন বা আচরণচ্যুতির দৃষ্টান্ত এত বহু এবং এত ঘনসন্নিবদ্ধ যে, সে আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হলেও কেউ কিছু মনে করে না—এ বিষয়ে সামাজিক

বিবেকটাই অসাড় হয়ে গেছে—, কিন্তু নারীর তরফে যা-ই সামান্য একটু ভুল হল অমনি পুরুষপ্রভু মারমুখো হয়ে উঠলেন। এটা কথার কথা নয়, যে কেউ মধ্যশ্রেণীর পরিবারগুলির জীবনধারা একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ করবেন তিনিই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমাদের চোখে মেয়েদের সামান্য অপরাধেরও ক্ষমা নেই। নারী যতক্ষণ পুরুষের মন জুগিয়ে চলতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মর্যাদা ও সমাদর, কিন্তু যা-ই সে কোন ব্যাপারে একটু স্বাধীন ইচ্ছা অনুসরণের চেষ্টা করল অমনি তার মর্যাদা লাঞ্ছিত ও খণ্ডিত হয়ে গেল। এই-যে প্রায়শ পুথি-কেতাবে এবং সমাজহিতকামীদের নিবন্ধাদিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক রুচিসঙ্গতির কথা (mutual adjustments) বলা হয়, সেটা আসলে একতরফা ব্যাপার। পরিবার-জীবনে পুরুষের রুচি প্রায়শ উভয়ের রুচির ছদ্মবেশ ধরে উভয়কে প্রতারিত করে। ছোট-খাটো বিষয়ে হয়তো স্ত্রীর রুচি স্বামীর দ্বারা মান্য হওয়ার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে; কিন্তু যেখানে গুরুতর আদর্শ বা রুচি নিয়ে প্রশ্ন সেখানে স্বামীর ইচ্ছাকে দাবিয়ে স্ত্রীর রুচি কোথাও প্রাধান্য পেয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। মেয়েদের প্রায়ই এ জাতীয় কথা বলতে শোনা যায়, 'আমার স্বামী এ-সব সভাসমিতি পছন্দ করেন না, আমি এতে আছি শুনলে উনি বড্ড রাগ করবেন, কাজেই আমাকে ভাই রেহাই দাও', কিংবা এই ধরনের আর-কিছু। কিন্তু কই, কোন পুরুষ তো ভুলেও কখনও বলে না, 'এ কাজ আমার স্ত্রীর ঘোরতর অপছন্দ, অতএব এ কাজ আমার পক্ষে করা বারণ'? অবশ্য অতিমাত্র স্ত্রৈণ স্বামীর কথা আলাদা। উৎকট সতীমার্কা নারী দিয়ে যেমন স্ত্রীজাতির বিচার হয় না তেমনি স্ত্রীর অঞ্চলমাত্রসার মোহগ্রস্ত স্বামী দিয়েও সাধারণ পুরুষকুলের বিচার হওয়া উচিত নয়। উপরের সংলাপাংশগুলিকে যথোচিত

গুরুত্ব না দিলে ভুল করা হবে। কথা অমনি ফস করে মানুষের মুখ থেকে বেরোয় না, কথা মনোবৃত্তিরই প্রকাশক। যে ভাব বা ভাবসকল একটি বিশেষ কালে মানুষের মন জুড়ে আছে তারই অভিব্যক্তি ঘটে তার কথায়, তার আচরণে। 'উনি শুনতে পেলে রাগ করবেন', তার অর্থ মেয়েদের সামান্য ভুলচুকে পুরুষদের রাগ করাই স্বভাব, আর সেই সম্ভাবিত ঘটনার ভয়ে মেয়েদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকাটাই এ সমাজের রীতি। 'উনি রাগ করবেন', যেন রাগ করায় পুরুষের বিধিদত্ত অধিকার।

আসলে আমাদের সংসারগুলিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার প্রেম নেই। প্রেমের একটা গতানুগতিক, বাজার চলতি ধারণা আমাদের মনে আছে। যথার্থ ভালোবাসার চেহারা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে কথা বলা প্রয়োজন। কামজ আকর্ষণকে সত্যকার ভালোবাসা বলে যেন আমরা ভুল না করি। নারী যেখানে পদে পদে পুরুষের করধৃতা হয়ে চালিতা, নারীর অর্থনৈতিক জীবন যেখানে পুরুষের দ্বারা সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত, ছোটখাটো পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারেও যেখানে নারীকে পুরুষের রুচিমাফিক চলতে হয়, সে স্থলে উভয়ের মধ্যে যথার্থ ভালোবাসা কেমন করে সম্ভব, বোঝা দুষ্কর। ভালোবাসার গোড়ার কথা হল পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রম-চেতনা। একপক্ষের সবময় প্রভুত্ব আর অন্য পক্ষের নিরবচ্ছিন্ন আত্মসমর্পণ দিয়ে যেখানে পরিবার-জীবনের কাঠামো গড়া, সেখানে এই সম্ভ্রম-চেতনা আদৌ আসতে পারে না। ব্যক্তিত্ব যার অবনমিত তার প্রতি সম্ভ্রম-চেতনা স্ফুরিত হওয়া সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই পারিবারিক জীবনে ভালো-বাসা অদ্যাপি অলভ্য বস্তু হয়ে আছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের বেলায় প্রায়শ ভালোবাসার একটা মনগড়া অবাস্তব ধারণা নিয়ে নিজেদের

চোখ ঠারা হয়; সত্যকার ভালোবাসার সঙ্গে সে ধারণার সম্পর্ক অল্পই।

স্বামী স্ত্রীর খোরপোষের মালিক এ ধারণাটাই আসলে যত বিপত্তির মূলে। একপক্ষের নীরন্ধ্র অর্থনৈতিক আধিপত্যের মত নিষ্ঠুর বস্তু আর নেই। মন্তব্যটি যেমন সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে, তেমনি ভালোবাসার সম্পর্কের বেলায়ও সমান প্রযোজ্য। বরং খতিয়ে দেখলে, ভালোবাসার সম্পর্কের বেলায়ই সমধিক প্রযোজ্য। ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য সব চাইতে বড় জিনিষ; একপক্ষের অর্থনৈতিক প্রভুত্বের দাপটে সেই সূক্ষ্মতা আর সৌকুমার্য পদে পদে ব্যাহত হয়, ক্লিষ্ট হয়, ক্লিন্ন হয়। পুরুষ যদি অহরহ মনে এই ভাব পোষণ করে যে, যেহেতু আমি নারীর খোর-পোষের যোগানদার সেই হেতু উক্ত আশ্রিতের সম্পর্কে আমার যা-খুশি-তা করবার অধিকার আছে, কিন্তু অপর পক্ষের প্রতি আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, সে ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে ভালোবাসার নামে স্বেচ্ছাচারটাই প্রধান হয়ে ওঠে। ভালোবাসা বাইরের কোন বস্তুর মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তার মূল্য তার নিজের ভিতর। স্ত্রীর সতীত্ব বিক্রেয় পণ্য নয় যে খোরপোষের দাম দিয়ে তা কেনা যাবে। আসলে স্ত্রীর সতীত্ব বল আর স্বামীর সতত্ব বল, ও দুইই ভালোবাসার মৌলিক আদর্শের ভিতর অনুস্যূত। বিশ্বাসের এতটুকু অমর্যাদায় প্রেমের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়। সুতরাং মূল্য দিয়ে বিশ্বাস ক্রয় করবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর কোন মূল্যে নয়, কেবল ভালোবাসার মূল্যেই শুধু ভালোবাসা প্রাপ্তব্য।

মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা এই। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা তার

চাইতেও শোচনীয়। পুথিগত বিদ্যার্জিত ঔদার্যবাদের আদর্শে আস্থাশীল মধ্যবিত্ত পুরুষের মনোভাবই যখন এই, সে স্থলে উচ্চতর মূল্যবোধে অবিশ্বাসী, জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত নিম্নমধ্যবিত্ত পুরুষের মনোভাব কী হতে পারে তা বোধ করি অনুমান করা যেতে পারে। প্রেমহীনতার বিষবাষ্পে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন রুদ্ধশ্বাস। স্ত্রীর প্রতি নিম্নমধ্যবিত্ত স্বামীর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই; স্ত্রীর উপর প্রভুত্বস্পৃহা খাটাবার নামে স্ত্রীকে সে কারণে-অকারণে উৎপীড়ণ করে, তার চোখে স্ত্রী স্বকীয় জৈব ইচ্ছা পরিতৃপ্তির এবং সেই সূত্রে সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। যেখানে এক পক্ষের সম্পর্কে অপর পক্ষের মনোভাবের ভিতর এর চাইতে উচ্চতর আদর্শের পোষকতা নেই, সেখানে কোন পক্ষেই শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। উৎপীড়ক স্বামীকে কোন্ স্ত্রী কবে ভালোবাসতে পেরেছে? আমাদের গল্পলেখকেরা গল্পে উপন্যাসে সতী নারীর সর্বপরীক্ষোত্তীর্ণ ভালোবাসার আবেগময় চিত্র আঁকতে বড় পছন্দ করেন। তাঁরা সাধারণ পাঠকের অবাস্তব কামনাকে সুড়সুড়ি দিয়ে দেখান, সতী নারীর ভালোবাসার এমনই জোর যে লম্পট বা অত্যাচারী স্বামীর অবহেলার কঠিন প্রাচীরে ঘা খেয়েও সে ভালোবাসা প্রতিহত হয় না, বরং স্বামী যত স্ত্রীকে পীড়ণ করে স্ত্রীর মমতা স্বামীর প্রতি তত বেশী উপছে পড়ে। এর চাইতে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। স্ত্রী কখনও অত্যাচারী স্বামীকে ভালোবাসে না, মমতা করে না। তেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মনে প্রবল ঘৃণা ছাড়া আর কোন মনোভাবেরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবু যে আমাদের গল্প-উপন্যাসগুলিতে এ জাতীয় চিত্র দেখানো হয় সে এই জন্য যে, স্বামী নামক আইডিয়ার তথাকথিত কার্যকারিতা নাকি

ভারতীয় নারীমনের উপর অসীম; তাই অতি বিসদৃশ, অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যেও স্বামিত্বের আইডিয়ার বিগ্রহের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ভারতীয় নারী স্বামীকে ভালোবাসতে ছাড়ে না। ব্যভিচারী, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে স্বীয় স্কন্ধোপরি বহন করে বারবনিতালয়ে নিয়ে যাওয়ার চিত্র যে সমাজে আদর্শ সতীত্বের চিত্ররূপে পরিগৃহীত হয়, সে সমাজে তথাকথিত সতীত্বের মহিমা কীর্তন করবার জন্য কোন সময়েই লোকের অভাব হবে না; কিন্তু তেমন সতীত্বের খুরে দূর থেকেই আমরা দণ্ডবৎ করি। সমাজজীবনে, পরিবারজীবনে নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা না দিয়ে সতীত্বের মহিমা কীর্তনের মত নৃশংসতা বুঝি আর নেই।

এখানেই শেষ নয়। জীবিকার তাগিদে এই-যে দলে দলে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মেয়ে আজকাল আপিসে-আদালতে ছুটছে তাদের অবস্থাও খুব বেশী আত্মমর্যাদার দ্যোতক নয়। পূর্বে একবার এ কথার আভাস দেওয়া হয়েছে, পুনরায় তার উল্লেখ করি। শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের আত্মমর্যাদার সহিত বহিঃসঞ্চরণের অধিকার তবু বরং সুরক্ষিত, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। অন্তঃপুরের বদ্ধ প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসাটাই মেয়েদের আত্মবিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সর্বাবস্থায় তাদের সম্ভ্রম আর মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির ঠোকর খেয়ে খেয়ে ক্রমাগত যদি মেয়েদের পথ চলতে হয়, সে ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিস্ফূর্তি ঘটা সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বাগ্রে চাই ভারতীয় পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক রূপান্তর। তবেই শুধু নারী সমাজের সত্যকার জাগরণ সম্ভব।

প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান

দেশ স্বাধীন হবার পর একটা জিনিষ লক্ষ করে যুগপৎ উৎসাহিত ও সন্ত্রস্ত হয়েছি। প্রাচীন ধারার শাস্ত্রজ্ঞান অনুশীলনের ঐতিহ্যের উপর হঠাৎ বড় বেশী ঝোঁক আরোপ করা হচ্ছে এবং যেসব শাস্ত্রজ্ঞানী ব্যক্তি আধুনিক জগতে বাস করেও প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীটিকে বাঁচিয়ে রাখবার সাধনায় নিয়োজিত, তাঁদের ব্যক্তিত্বকে সব দিক থেকে আদর্শ ব্যক্তিত্বরূপে জনসমক্ষে তুলে ধরবার বিধিবদ্ধ চেষ্টা চলছে। উৎসাহিত, কারণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর একদেশদর্শিতাকে খণ্ডন করবার জন্য প্রাচীন ধারার শাস্ত্রবিদ্যা অনুশীলনের প্রয়োজন আছে এবং যে ব্যবস্থায় এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সে ব্যবস্থার কিছু-কিঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অপর পক্ষে, সন্ত্রস্ত হবারও সঙ্গত হেতু আছে। সন্ত্রস্ত, কেন না প্রাচীন ধারার শাস্ত্রবিদ্যা অনুশীলনের আদর্শের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এবং এই আদর্শটিকে কোন প্রকারে যদি একবার জনচিত্তে বদ্ধমূল করে তোলা যায়, তা হলে আধুনিক ধারার জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে। অথচ কে না জানে যে, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন ছাড়া আধুনিক জগতে চলবার উপযোগী জীবনদর্শন গড়ে তোলা ভার?

নিছক আধুনিক জ্ঞানের আদর্শের ভিতর একদেশদর্শিতা আছে, তবে তার উত্তর এই যে, কোন্ জ্ঞানের ধারার ভিতর একদেশদর্শিতা নেই? আধুনিক ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যদি একচক্ষু

হন, তবে প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানীরাই বা একচক্ষু নন কেন? তাঁদের কি আধুনিক জীবনের বিশেষ সমস্যা ও জটিলতাগুলি বোঝবার মত মানসিক প্রস্তুতি আছে? না, সে সব বোঝবার তাঁরা চেষ্টা করেন? আধুনিক জীবনের অযুত প্রশ্ন ও সমস্যার নিরসনের চেষ্টা না করে তাঁরা এক কল্পিত শ্রেষ্ঠ প্রাচীনত্বের আদর্শকে আধুনিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, যা প্রায় গোলাকার রন্ধ্রের মধ্যে চতুষ্কোণ কসি ঢোকাবার মতই বিসদৃশ ব্যাপার প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব বিশেষ কতকগুলি সমস্যা থাকে, এবং সে সকল সমস্যার সমাধান সেই বিশেষ যুগোচিত ধারাতেই করণীয়। যাঁদের এই বিশেষ যুগোচিত ধারার সঙ্গে পরিচয় নেই তাঁরা প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্যায় যত বড় সুপণ্ডিতই হোন না কেন, আধুনিক জীবনের সমস্যার নিরাকরণ তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানকে একটা ভারী বিদ্যার বোঝা হিসাবে নিয়ত বহন করা ছাড়া সম্ভবতঃ এঁদের আর কিছু করবার থাকে না। শাস্ত্রজ্ঞান ভালো, তবে সে শাস্ত্রজ্ঞান যদি নিছক রক্ষণশীলতার পরিপোষক হয়ে দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রে আপত্তি না জানিয়ে পারা যায় না।

বর্তমান নিবন্ধের যা আলোচ্য বিষয় সে প্রসঙ্গের অকারণ অবতারণা করি নি। সম্প্রতি বিশেষ একটি উপলক্ষ্যে লেখকের মনে এ জাতীয় চিন্তার উদয় হয়েছে। কলকাতার কোন একটি সুপ্রচারিত বাংলা দৈনিকের স্তম্ভে কিছুকাল যাবৎ ধারাবাহিক ভাবে বাংলা দেশের জ্ঞানীগুণী মনীষীদের জীবনকথা আলোচিত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি আলোচনাগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। (মনীষী জীবন কথা: সুশীল রায়, দুই খণ্ড। এ আলোচনার একটা সুফল এই হতে পারে যে, এতে সংবাদপত্রসুলভ নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রসঙ্গ থেকে মনোযোগ এমন জায়গায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা হয়েছে যার সংবাদগত মূল্য বেশী না হতে

পারে, কিন্তু ভাবগত মূল্য আছে। একাগ্র নিষ্ঠায় জ্ঞানের যাঁরা সাধনা করেন—তা সে যে ধরনের জ্ঞানই হোক—তাঁরা সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যার অনুরাগে বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট, সতত জ্ঞানানুশীলনরত জ্ঞানতপস্বীদের সমাজজীবনে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্য। কারণ তাঁদের আত্মসমাহিত, নির্লোভ বিদ্যানুরাগের আদর্শ প্রাত্যহিক জীবনের আঘাতে সংঘাতে সংক্ষুব্ধ অশান্ত মনকে শান্ত হবার প্রেরণা দেয়, খ্যাতিপ্রয়াসী অত্যুগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমিত করে, নিম্নতর মূল বোধগুলির ঊর্ধ্বে উচ্চ মূল্যবোধের আদর্শ স্থাপন করে মানুষকে মহত্তর জীবন যাপনে প্রণোদিত করে।

এ পর্যন্ত খুবই ভালো, তার পরের ধাপেই দেখা দেয় মুস্কিল। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আলোচ্য মনীষী জীবন কথা সংকলনের পশ্চাতে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা আছে। সংকলনকারী সেই সব জ্ঞান সাধকের জীবন কথা সংকলনে সমধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, যাঁরা জীবনযাপনের প্রাচীন ধারায় বিশ্বাসী এবং তদনুপাতে আধুনিক জীবনদর্শন সম্পর্কে অচেতন। অবশ্য, দু'একজন আধুনিক ধারার জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনকারী বৈজ্ঞানিকের জীবনী এই পর্যায়ে স্থান পেয়েছে অস্বীকার করব না, তবে ব্যতিক্রম হিসাবেই তাঁদের প্রসঙ্গের অবতারণা। লক্ষণীয় এই যে, জীবনী আলোচনায় যাঁদের অগ্রপ্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই ব্রহ্মণ্যধর্মের সমর্থক,জীবনচর্যায় সংরক্ষণশীলতার পরিপোষক, অতীতাশ্রয়ী, এবং এ যুগের বিষয়ে নিরেট অজ্ঞ। যে নীতির ভিত্তিতে এই জীবনীগুলি নির্বাচন করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মভাবে এই রকম একটা ভাবপ্রকাশের চেষ্টা আছে যে, আধুনিক পদ্ধতিতে যে সকল বিদ্যানুরাগী জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁদের প্রয়াস দূষ্য, পক্ষান্তরে বিদ্যার ক্ষেত্রে সনাতন পন্থার অনুবর্তী পণ্ডিতেরাই একমাত্র শ্রদ্ধা ও মর্যাদার

অধিকারী। আরও সোজাসুজি বললে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, আলোচ্য জীবনী-সংকলনের মধ্যে আধুনিক ধ্যান-ধারণাকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করে ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন, গোঁড়া আদর্শটিকে সর্বজনমান্য আদর্শ-রূপে তুলে ধরবার বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা হয়েছে। যেন অতীত জ্ঞানটাই সব, আধুনিক জ্ঞান কিছু নয়; যেন সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের আদর্শটাই বিদ্যার ক্ষেত্রে একমাত্র অনুধাবনযোগ্য আদর্শ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সমন্বয়ে এ যুগের জ্ঞানপ্রয়াসীরা যে এক অখণ্ড, যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমার এ অনুমানমাত্র নয়; জীবনী নির্বাচনের রীতি, নির্বাচিত মনীষীদের মুখের কথা, সংকলনকারীর নিজস্ব বক্তব্য—সবই উক্ত ধারণাব অনুকূলে স্পষ্ট সাক্ষ্য যোগাচ্ছে। পুরাতন ধারার জীবনরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাহাত্ম্য এ গ্রন্থে একটু বেশী মাত্রাতেই কীর্তন করা হয়েছে। সংরক্ষণশীলতার সপক্ষে এমন উদ্দেশ্যমূলক ওকালতি অনেক কাল বাংলা সাহিত্যে শোনা যায় নি। গোঁড়ামির এ জাতীয় জয়ঘোষণা কোমলমতি তরুণমনের উপর কী ধরণের প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

দয়া করে লেখককে কেউ ভুল বুঝবেন না। খ্যাতির অপেক্ষা-বিহীন নির্লোভ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার ঐতিহ্যের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা কারও চাইতে কিছু কম নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানের অনুশীলনই হোক আর আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনই হোক, জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান অনুশীলনের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। বৈষয়িক সমুন্নতির আকাঙ্ক্ষাকে দমিত রেখে জ্ঞানসাধনাকেই যাঁরা জীবনের মুখ্য কর্মরূপে বরণ করেন তাঁরা নমস্য ব্যক্তি বই কি। প্রাচীন শাস্ত্র-জ্ঞানের অনুশীলন অবশ্যই শ্রদ্ধার্হ কর্ম। কিন্তু প্রশ্ন তো শাস্ত্রজ্ঞানের

অনুশীলন নিয়ে নয়; উক্ত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কি জাতীয় মনোভাব প্রকটিত হচ্ছে তা নিয়ে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞানের অনুশীলনের অর্থ যদি এই হয় যে, আধুনিক জীবনের অযুত সমস্যাবলীর দিকে পিঠ দিয়ে থাকব, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সামান্যতম জ্ঞানসংগ্রহেরও প্রয়োজন বোধ করব না, কথায় কথায় আধুনিক যুগের তথাকথিত অধোগতির সমালোচনা করে 'সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ' বিগত কালের জন্য আর্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলব, এ-কালের তাবৎ চিন্তাধারার ব্যাখ্যা পুরাতন শাস্ত্রগ্রন্থের কীটদষ্ট পুঁথির পাতায় খুঁজব—সে ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানাতেই হয়। মনে রাখা দরকার যে, জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের অনুশীলনের আদর্শ ততদুর পর্যন্তই মান্য যে পর্যন্ত তা মানুষের মনে বিদ্যানুরাগ বৃদ্ধি করে। কিন্তু সব জ্ঞানেরই একটা ব্যবহারিক ভিত্তি আছে। নিছক 'নরঃ নরৌ নরাঃ' বা 'bla ব্লে cla ক্লে' মুখস্থ করবার জন্যে কেউ জ্ঞানার্জন করে না। ব্যবহারিক প্রয়োগবিরহিত শাস্ত্রীয় শ্লোকের অবলীলায়িত আবৃত্তি বস্তুতঃ পক্ষে ঐ 'নরঃ নরৌ নরাঃ' জাতীয় কণ্ঠস্থ জ্ঞানের কোঠাতেই পড়ে। এ জাতীয কণ্ঠস্থকরণের মধ্যে স্মৃতিশক্তির প্রমাণ থাকতে পারে, বিচারবুদ্ধির প্রমাণ নেই। অভিধান মুখস্থ করে বিচ্ছিন্ন শব্দজ্ঞানের প্রমাণ দেওয়া যায়, সুষ্ঠু শব্দগ্রন্থন দ্বারা উপযুক্ত ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার পরিচয় ওতে নেই। সুতরাং জানবার জন্যই জানবার আগ্রহের (knowledge for knowledge's sake) কোথাও না কোথাও একটা সীমারেখা আছে। এবং যেখানে এই সীমারেখা সেখান থেকেই প্রযোগের আরম্ভ। বিদ্যার ব্যবহারিক প্রযোগেই বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। যিনি যে বিদ্যারই অনুশীলন করুন, তাঁর কাছ থেকে এটুকু অন্ততঃ প্রত্যাশা করা যায় যে, তিনি সমসাময়িক জীবনের বিচিত্র সমস্যাবলীর বিষযে চিন্তা করবেন এবং স্বকীয় বিদ্যার্জিত পন্থায় তাদের যে কোন একটির অন্ততঃ আংশিক

সমাধানের চেষ্টা করবেন। কিন্তু আগাগোড়াই যদি তাঁর জ্ঞান পুঁথির পাতায় নিবদ্ধ থাকে—এবং তাও এমন পুঁথি যা কালের রূঢ় হস্তাবলেপ-স্পর্শে বিবর্ণ মলিন—তা হলে আর সেই জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়। মস্তিষ্কের কোটরে কে কত বেশী বিদ্যা ধারণ করতে পারেন সে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য জ্ঞান নয়, জ্ঞান জীবনচর্যার জন্য, জীবনের জটিল পথ সরলীকৃত করবার জন্য। আধুনিক জীবন অযুত সমস্যার দ্বারা কণ্টকিত। যে জ্ঞানসাধনার পথে এ সকল সমস্যা সমাধানের সামান্যতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না সে জ্ঞান তার নিজস্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মান্য হলেও বহুলাংশে খণ্ডিত।

আমাদের অধিকাংশ প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানী সম্পর্কেও এই কথা। এঁরা বাস করছেন এ কালে, কিন্তু এ কালের কোন ছাপ এঁদের মনের উপর নেই। শাস্ত্রচর্চার অজুহাতে জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর নীতিতে এঁরা বিশ্বাসী। শাস্ত্র এঁদের নিকট অব্যাহতিবাদের শ্রেষ্ঠ পরিপোষক। এঁরা শাস্ত্রের হাত ধরে চলেন, কেন না তা হলে আর আধুনিক জীবনের সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় না, আধুনিক যুগে বাস করেও আধুনিক যুগের দায়িত্ব এড়ানো যায়। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধনার ঠাট বজায় রাখার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তাতে জনজীবন থেকে শতহস্ত দূরে থাকা যায় এবং তথাকথিত শান্তিনীড়ের সংগোপন নিভৃতিতে যদৃচ্ছা আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করা যায়। এরূপ অভ্যাসের আরও সুবিধা এই যে, এতে যখন-তখন প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের মহিমা কীর্তন করা যায়, অথচ বর্তমানকালীন সরকারী বদান্যতার খাত-বাহিত পেন্‌সন ভোগে কোন বাধা থাকে না। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের বিশুদ্ধ হাওয়া সেবন করে আর যা-ই সম্ভব হোক বেঁচেবর্তে থাকা যে যায় না এ জ্ঞান এঁদের বেশ টনটনে আছে, এদিকে ফল-

মূলাহারী প্রাচীন ঋষি সুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শের কতই না জয়নাদ। আধুনিক জীবনের আরামস্বাচ্ছন্দ্যগুলি অনাপত্তির সঙ্গে ভোগ করে তারপর বিনা দ্বিধায় আধুনিক জীবনযাত্রার মুণ্ডপাতের অকৃতজ্ঞ দৃষ্টান্ত বোধ করি প্রাচীন ধারার শাস্ত্রজ্ঞানীদের মধ্যেই সব চাইতে বেশী মিলবে।

হয়তো বলা হবে, শাস্ত্রজ্ঞানীরা সমাজের সেবা করেন না সে কথা ঠিক নয়। তাঁদের জীবনের একটা মূল্যবান অংশ ব্যয়িত হয় অধ্যাপনায়, বহু শিষ্যকে ছাত্রকে তাঁরা বিদ্যাদান করেন, আর এই বিদ্যাদান ব্রতের মধ্যেই তাঁদের জ্ঞানের সার্থকতা।

কথাটা ঠিক এবং ঠিক নয়। বিদ্যাদান একটি বৃত্তি। কিন্তু এটি পুনরাবৃত্তিমূলক, খুব কম ক্ষেত্রেই সৃষ্টিধর্মী। ছাত্র-শিষ্যকে উপযুক্ত ভাবে মানুষ করে গড়ে তোলার নামে সচরাচর যা করা হয় তা হচ্ছে, স্বীয় অধীত বিদ্যা উগড়ে ছাত্রকে তার একটা অংশ দেওয়া। ছাত্র তার স্বকীয় প্রতিভার জোরে এই রোমন্থনমূলক বিদ্যার জটিলতা ভেদ করে মানুষ হবার পথ খুঁজে পায় তো ভালো, নয়তো অর্জিত বিদ্যা পুনরাবৃত্তির চড়ার মধ্যেই প্রায়শ আটকে থাকে। পুনরাবৃত্তিমূলক বিদ্যা মাত্রই বন্ধ্যা বিদ্যা, এ কথা স্বীকার করা ভালো। শুধু প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানী কেন, অধ্যাপনাকার্যে নিয়োজিত আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই বিদ্যার ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিনির্ভর। যৌবনে অধীত বিদ্যা রোমন্থন করতে করতেই তাঁদের সারা জীবন কেটে যায়। বেশীর ভাগ অধ্যাপকের কৃতিত্ব নিরূপিত হয় তাঁদের উদ্বমনকুশলতায় এবং ভাষ্যরচনায়। অর্থাৎ ক্লাশের চতুঃসীমার অভ্যন্তরে এককালীন অর্জিত বিদ্যা কে কত বেশী ওগড়াতে পটু এবং পুরনো, পচা, নিমতিতো পাঠ্যবিষয়ের টীকা-টিপ্পনি রচনায় কে কত অনলস তারই উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের অধ্যাপকদের

সাফল্যের পরিমাপ। কিন্তু নূতন নূতন মৌলিক রচনার দ্বারা চিন্তার পুঁজি সমৃদ্ধ করা, সৃষ্টিকল্পনার সীমানা সম্প্রসারিত করা, চিন্তা ও কল্পনার অবদান দ্বারা আধুনিক যুগের সমস্যাগুলির সমাধানে যত্নবান হওয়া—সে পেশাদার অধ্যাপকের জন্য নয়। তাঁরা সব রয়েছেন পুরনো বুলি তোতাপাখির মতো মুখস্থ বলবার জন্যে, তাঁরা কেন জাতির সৃষ্টিধর্মী জ্ঞান-সাধনার ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় পোহাতে যাবেন? সে কাজের জন্য আছেন আলাদা লোক, যাঁরা বৃত্তিতে অধ্যাপক নন অথচ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ যাঁদের জীবনচর্যার মধ্যে প্রতিফলিত। অর্থাৎ এঁরা চিন্তার মৌলিকত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এবং সেই হেতু শাস্ত্রজ্ঞানীদের মত পুরাতনের জাবর না কেটে নিত্য নূতন ভাব পরিবেশনে সচেষ্ট। যেমন রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী। প্রচলিত সংজ্ঞার্থে এরা কেউ অধ্যাপক নন বা শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত নন। কিন্তু প্রত্যেকেরই চিন্তার কি দ্যুতি ও বলিষ্ঠতা! আমাদের সাহিত্যের ভাব ও জ্ঞানের সীমার সম্প্রসারণ শাস্ত্রজ্ঞানীরা করেন নি, করেছেন মুখ্যতঃ এঁরাই। অথচ এঁদের কেউ তাই বলে পুরনো পুঁথির উপর চোখ ডুবিয়ে পড়ে থাকেন নি। পুরাতন শাস্ত্র-গ্রন্থকপচানো স্মৃতিমাত্রসার পণ্ডিত দেশে ঢের পাওয়া যাবে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বুঝি দেশে একবারই মাত্র হওয়া সম্ভব। শাস্ত্রজ্ঞান যেখানে গোঁড়ামির নামান্তর, এক-বর্ত্মাভিমুখী প্রবণতার পরিপোষক, সে স্থলে সমন্বয়পন্থী আধুনিক জীবন-যাত্রার আদর্শের মুখ চেয়ে আপত্তির ভাষা উচ্চারণ করতেই হয়। * সমাজে

* প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতীতমুখী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শাস্ত্রবিদ্যার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। নজীর: তৎকালীন কাউন্সিল অব এডুকেশন ও ডাঃ মোয়াটের নিকট লিখিত বিদ্যাসাগরের পত্র। ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার-এর উনবিংশ শতাব্দীর পথিক গ্রন্থের ৫০—৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রজ্ঞানীর প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানীর চাইতেও বেশী দরকার মৌলিক চিন্তানায়কের, কল্পনাসমৃদ্ধ সৃষ্টিকুশল পুরুষের। পৌনঃ-পুনিকতার আবর্তের মধ্যে পাক খেয়ে ফেরাই যদি শাস্ত্রজ্ঞানের একমাত্র কাজ হয়, তবে সে শাস্ত্রজ্ঞানকে বেশী আমল না দেওয়াই ভালো।

অনেকে সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের কথা বলতে গিয়ে গদগদ হয়ে পড়েন এবং টোলের শিক্ষাব্যবস্থা দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে বলে আক্ষেপোক্তি করেন। টোলের ব্যবস্থায় যে পদ্ধতিতে সচরাচর বিদ্যাদান করা হত তার বহুতর উপকারিতা মানি, কিন্তু বর্তমান জীবনযাপনের রীতির সহিত তার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে কি না সে প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই উত্থাপন করা চলে। বর্তমান সমাজ সুবৃহৎ নৈমিষারণ্য নয় যে সেখানে ইচ্ছা করলেই প্রাচীন গুরুগৃহের আবহাওয়া সঞ্চার করতে পারা যাবে। আধুনিক কিশোর ছাত্র নিকার-বোকার-পরা, কাঁধে-ব্যাগ-ঝুলানো. পায়ে-জুতো সুবেশ শিক্ষার্থী, গৈরিক বসনাবৃত বা চীরধারী ব্রহ্মচারী বালক নয়। বিদ্যার্থীর জন্যই গুরু, গুরুর জন্য বিদ্যার্থী নয়। বর্তমান যুগধর্মের দরুণ বিদ্যার্থীর স্বরূপের যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে বিদ্যাদাতার স্বরূপেরই বা পরিবর্তন হবে না কেন। সংস্কৃত ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় তাতে সন্দেহ কি, তা বলে টোল-চতুষ্পাঠীর নির্বোধ আবহাওয়ার ভিতর নয়। টোল-চতুষ্পাঠীর শান্ত, নিভৃত পরিবেশ বিদ্যাদানকার্যের যদি বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে তবে সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয় যে, সে লাভের পিঠে মস্ত একটা ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। টোল-চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থীরা একনিবিষ্ট দীর্ঘকালীন অধ্যয়নের দ্বারা সাংখ্য ন্যায় কাব্য ব্যাকরণ প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুরুর আশীর্বাদসহ গুরুগৃহ থেকে যখন নিষ্ক্রান্ত হন, দেখা যায় আধুনিক জগতের ধ্যানধারণা কিছুমাত্র তাঁদের মগজে প্রবেশ করে নি, বর্তমান সভ্যতার মর্ম উপলব্ধি করবার

মত মানসিক প্রস্তুতির শিক্ষা গুরুর কাছ থেকে কিছুমাত্র তাঁরা লাভ করতে পারেন নি। তাঁরা আধুনিক কালে বাস করেও আধুনিক কালের কেউ নন। এ যুগের প্রবহমান ভাবধারাগুলির স্বরূপ ও তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারেন না, বোঝবার মতো ধৈর্যও তাঁদের নেই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে তাঁরা অজ্ঞতাপ্রসূত অনাত্মীয়তার জ্ঞানে দূরে ঠেলে রাখেন, যেন সনাতন ভারতীয় সভ্যতাই তাবৎ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র খাঁটী বস্তু, বাদবাকী সব ঝুটা। শিক্ষার এই একপেশেমি ও গোঁড়ামি প্রাচীন ধারার সংস্কৃতশিক্ষার্থীদের মধ্যে যত প্রবল এমন আর কারও মধ্যে নয়। বিশেষ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক বিদ্যার্থীদের মধ্যে আরও বেশী। বৈদিক জ্ঞান মূলতঃ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছিল বলে একালীন ব্রাহ্মণ-দেরও প্রাচীন বিদ্যা সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব বড় টনটনে। উপবীতের মাহাত্ম্যে ও বংশকৌলীন্যে তাঁরা এখনও আস্থাশীল। বৈদিক যুগ সম্বন্ধে কথা উঠলে গদগদ ভাবালুতায় এঁদের প্রায় মুক্তকচ্ছ হবার যোগাড় হয়, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যেটি শ্রেষ্ঠ কাল সেই বৌদ্ধ যুগ সম্বন্ধে যেই কথা উঠল, অমনি এঁরা সহসা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। যেন আধ্যাত্মিক সমুন্নতির নৌকা বৈদিক যুগকে আশ্রয় করে তর তর গতিতে বয়ে চলছিল, বৌদ্ধযুগে এসে ব্রাত্য আচার-আচরণের চড়ায় ঠেকে হঠাৎ বেচাল হয়ে গেল। আবার হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগের প্রসঙ্গ উঠতেই সে কী উচ্ছ্বাস! যেন শঙ্করাচার্য ভারতীয় জনগণের শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা, ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন থেকে রক্ষা করে মহা কাজ করেছেন। এ রকম সংরক্ষণশীল মনোভাবের যাঁরা পরিপোষক, তাঁদের যুক্তিবুদ্ধি আধুনিক জ্ঞানব্রতী প্রগতিশীল মনের উপর দাগ কাটতে পারে না, বলাই বাহুল্য।

সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানচর্চার আবহাওয়ায় বর্ধিত প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের

আর-একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এঁরা, যখন যিনি দেশে রাজা থাকেন তাঁর প্রতি ভক্তিভাবের আতিশয্যে সর্বদাই গললগ্নীকৃতবাস। রাজতন্ত্রের প্রতি বদ্ধমূল আনুগত্যের মনোভাব থেকেই এরূপ আচরণের জন্ম। সংস্কৃতজ্ঞানী পণ্ডিতসমাজ ব্রিটিশ আমলে কীরকম নতজানু দাস্যতার সহিত ব্রিটিশ শাসনকে আঁকড়ে' ছিলেন সে কথা সকলেই জানেন। ঘটনাটি এতই সাম্প্রতিক কালের যে অনিশ্চিত অতীত ইতিহাসের কল্পিত মহিমার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে তার আবরণে সে তিক্ত স্মৃতি আড়াল করা একটু কঠিন। পণ্ডিত সমাজের ইংরেজ-নির্ভরতা যত প্রবল ছিল সেই অনুপাতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রতি তত বিমুখতা ছিল। বস্তুতঃ, দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গ, খেতাবধারী ভারতীয় উচ্চ সরকারী কর্মচারী, জমিদার, মহাজন প্রভৃতির ন্যায় এই পণ্ডিত সমাজও ছিল এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা যে টোলের মহামহোপাধ্যায়-বর্গীয় পণ্ডিতদের জন্য দরাজ হাতে বৃত্তি বা পেন্‌সনের ব্যবস্থা করেছিলেন তার মূল নিহিত ছিল এইখানে। ভারতের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শাসনব্যাপারে এ দেশের পণ্ডিত সমাজের কাজ থেকে কোনদিন এতটুকু বাধাও পান নি। বরং আনুগত্য ও স্তুতি লাভ করেছেন ষোল-আনা। ইংরেজ রাজপুরুষদের বন্দনায় পণ্ডিত সমাজের কণ্ঠ মুখর ছিল। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডোয়ার্ড এবং 'রাজা মোদের পঞ্চম জর্জ রাণী মোদের মেরী'-র প্রশস্তি কীর্তনে সরকারী বৃত্তিভোগী পণ্ডিতদের লেখনী ছিল অনলস। ইংরেজ রাজপুরুষবর্গ এঁদের বিশেষ সস্নেহ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন তার কারণ, তাঁরা জানতেন এঁদের কাছ থেকে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা নেই। পণ্ডিত সমাজও রাজতন্ত্রের মর্যাদা তাঁদের আচরণ দ্বারা বিলক্ষণ রক্ষা করেছিলেন। রাজতন্ত্রের যিনি প্রতীক তিনি বিদেশী হলেও কাছে

সম্মান জানাতে এঁদের বাধা হয় নি, কেন না প্রতীক বড় কথা নয়, প্রতীকের আধার যে মূল নীতি সেইটে বড় কথা, আর এই নীতির ক্ষুরে পণ্ডিত সমাজের মাথা চিরকালের জন্য মুড়োনো। রাজতন্ত্রের আদর্শে পণ্ডিত সমাজের আস্থা অবিচলিত ও নিবিড়। পণ্ডিত সমাজের কণ্ঠনিঃসৃত গদগদ ভাষ যে-কোন রাজা বা রাণীর চরণে পুষ্পার্ঘ্যের মত ঝরে পড়তে ব্যাকুল, তা তিনি রাণী অহল্যাবাঈই হোন আর রাণী এলিজাবেথই হোন। এঁদের চক্ষে স্বদেশীয় ও পরদেশীয় রাজার পার্থক্য শুধু তাঁদের গাত্রবর্ণের উজ্জ্বলতাব তারতম্যে, নইলে প্রতীকপূজার বেলায় তাঁরা জাতিভেদ আদৌ মানতে প্রস্তুত নন। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে বৈষয়িক বুদ্ধিব এমন সংযোগ সচরাচব দেখা যায় না।

আধুনিক জ্ঞানের আদর্শের মধ্যে একদেশদর্শিতা আছে, অসহিষ্ণুতা আছে আত্মাভিমান আছে, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের অনুশীলনকারী ব্যক্তি সে ক্রটীবিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নিযত তিনি তাদের সংশোধনে সচেষ্ট। আধুনিক বিদ্যার্থীর নিকট জ্ঞানের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই ধারাই সমান শ্রদ্ধেষ। প্রত্যেক দেশের শিক্ষা-সভ্যতার ধারার মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বরণীয় মহান তাকেই তিনি আত্মস্থ কববার সাধনায নিয়োজিত, শুধু একপেশে প্রাচীন প্রাচ্য জ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকার মূঢ়তা তাঁর নয। মনের অনেক দরজা, তাদের সবকটিতে কুলুপ এঁটে শুধু একটি দরজা খুলে রাখার ভ্রান্ত নীতি আর যাঁর নিকটই মান্য হোক, আধুনিক ধারার বিদ্যার্থীর নিকট মান্য নয়। কেন না সংস্কৃতি তাঁর চক্ষে একটি বদ্ধ জলাশয় নয়, বিভিন্ন স্রোতোধারায় পরিপুষ্ট এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র। এ সমুদ্রে নানা দিগ্‌দেশাগত জলরাশির সঙ্গম ঘটেছে। আর এ মহাসমুদ্রের জলে অবগাহন-স্নানই হল আধুনিক বিদ্যার্থীর বিধিলিপি ও সাধনা।

লেখক হওয়ার রহস্য

সাধারণ পাঠক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অনেক সময় কৌতূহলী হয়ে জানতে চান, লেখকদের লিখন-নৈপুণ্যের ভিতরের রহস্যটা আসলে কী। লিখন-ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই কৌতূহল অস্বাভাবিক বলতে পারি না। শিল্পী শ্রেণীর মানুষদের সম্পর্কে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ যুগ যুগ ধরে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছে, সে অনুসন্ধিৎসার আজিও অবসান হয় নি। বরং আধুনিক যুগে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের দিনের সাহিত্য বিচারে বিশুদ্ধ সাহিত্যের বিচার যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বেরও পরিমাপ করতে হয়। ব্যক্তি-বিচার ও সাহিত্য-বিচার মিলে সাহিত্য-কর্মের যে যৌগিক মূল্যায়ন, সেইটেই আজকের দিনের সাহিত্য সমালোচনার স্বীকৃত মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবণতা ও অভ্যাস ভেদে লেখকদের মধ্যে কেউ প্রেরণার উপর নির্ভরশীল, কেউ অধ্যবসায়ের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। যাঁরা প্রেরণাবাদী, তাঁদের রচনা প্রয়াসের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় বিরতির অধ্যায় বিলম্বিত থাকে। এর কারণ প্রেরণা বা 'মুড' বা 'ইনস্পিরেশন' জিনিসটা কখনও দীর্ঘকালস্থায়ী হতে পারে না। একটানা ধারাবাহিকতা প্রেরণার লক্ষণ নয়। দমকা বাতাসের মত প্রেরণার আবির্ভাব, আবার এক দমকেই তার অন্তর্ধান। প্রেরণার উপর নির্ভরশীল সাহিত্যকর্ম স্বতঃই বিরতিচ্ছেদযুক্ত হতে বাধ্য। এ থেকে আর একটি তথ্য আমরা এই পাই যে, প্রেরণাবাদী লেখকদের রচনা সচরাচর শ্রেষ্ঠ শিল্পোৎকর্ষমণ্ডিত হয়, কিন্তু সৃষ্টির প্রাচুর্যের গৌরব তাঁরা

দাবী করতে পারেন না। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। প্রেরণা বস্তুটি আকস্মিক, তাকে শুভ লগ্নের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়। অনেক প্রতীক্ষার পর বিশেষ মুহূর্তটিতে দৈব আশীর্বাদের মত যার আবির্ভাব, সে বস্তুর প্রভাবাধীন শিল্পসৃষ্টি কোনক্রমেই প্রাচুর্যলক্ষণাক্রান্ত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে, লেখকদের মধ্যে যাঁরা মূলতঃ অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করেন, তাঁরা অভ্যাসের দ্বারা লিখনকর্মে এমন সাবলীল পটুত্ব অর্জন করেন যে, যে-কোন সময় যে-কোন অবস্থায় তাঁরা কিছু-না-কিছু লিখতে পারেন এবং সে লেখার মান সব সময়েই অল্প-বিস্তর শিল্পরসোত্তীর্ণ হয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "Creation is ninety percent perspiration, ten percent inspiration." সৃষ্টিকর্মের শতকরা নব্বুই ভাগ অধ্যবসায়, দশ ভাগ মাত্র প্রেরণা। পেশাদার লেখকদের সম্পর্কে শিল্পকর্মের এই সংজ্ঞা বিশেষভাবে প্রয়োগ করা চলে। পেশাদার লিখিয়ে মাত্রই অধ্যবসায়ী লেখক। প্রেরণার উপর নির্ভর করলে তাঁদের চলে না। তাঁদের ফরমায়েসের তাগিদে লিখতে হয়, প্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কখন তাঁদের মগজে এসে ভর করবেন, সেই আশায় হা-পিত্যেশে দিন গুজরান করলে তাঁদের আর জীবিকানির্বাহ হয় না। যতক্ষণ তাঁরা প্রেরণার আশায় দৈব দাক্ষিণ্যের দুয়ারে হাত পেতে বসে থাকবেন, ততক্ষণে ফরমায়েসী লেখার শেষ তারিখের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সচ্ছলবিত্ত শৌখীন লেখকদের প্রেরণাবাদী সাহিত্যিক হওয়া মানায়, পেশাদার লিখিয়েদের নয়।

তা বলে পেশাদার লেখকদের লিখন-পরিকল্পনার ভিতর প্রেরণার স্থান আদৌ নেই, এ কথা মনে করা চলে না। তাঁদের জীবনে প্রেরণা মনের আকাশে ভাব বা কল্পনার আকস্মিক বিদ্যুৎ বিকাশ নয়, তাঁরা

মনের আকাশটিকে সব সময় বিদ্যুৎদীপ্ত করে রাখবার পক্ষপাতী। অভ্যাসে অভ্যাসে তাঁরা প্রেরণাকে মনের একটি নিত্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে তোলেন। অধ্যবসায়টা তাঁদের সাহিত্য-জীবনের বহিরঙ্গ মাত্র, সেই অভ্যাসকুশল সাহিত্য জীবনের গহনে রয়েছে প্রেরণার শাশ্বত উৎস। সাহিত্যিকের জীবনে প্রেরণার পোষকতা গভীর বলেই তিনি সাহিত্যিক, নয়তো গড্ডলিকাবাহী চাকুরে বা ব্যবসায়ী হওয়ার তাঁর বাধা ছিল না। আসল কথা, পেশাদার সাহিত্যিক হোন আর শৌখিন সাহিত্যিক হোন, এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরই অন্তরে রয়েছে প্রখর শিল্পানুভূতি। তবে শৌখীন আর পেশাদার সাহিত্যিকের ভিতর তফাত এই যে, শৌখীন লেখক প্রেরণার উপর নির্ভর করবার মত বিলাস ও অবসরের অধিকারী, পক্ষান্তরে পেশাদার লেখকের জীবনে স্রেফ সে সুযোগ নেই। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পেশাদার লিখিয়েমাত্রকেই আরাম-আয়েস বিলাস ইত্যাদিকে নির্মম হস্তে ছাঁটাই করতে হয়।

রচনার ব্যাপারে এক-এক লেখকের এক এক রকম ধারা। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি পছন্দ লেখকের সৃষ্টিতৎপরতাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। কেউ আছেন, যিনি রচনা শুরু করবার আগে অনেকখানি সময় মনে মনে পাঁয়তারা ভাঁজেন। রচনার উপজীব্য বিষয়ের একটি ছবি মনের ভিতর যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মাত্র তখনি তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসেন। আবার কেউ কেউ আছেন, যিনি রচনাকর্মে আত্মনিয়োগ করবার পূর্বে বিশেষ কিছু ভাবেন না, স্রেফ গা-ঢিলা দিয়ে বসে থাকেন। দেহের ও মনের আড়মোড় ভাঙতেই তাঁর অনেকখানি সময় চলে যায়। খানিকটা মধুর আলস্য, খানিকটা মন্থর স্রোতে সময় বয়ে যেতে দেওয়া—এই মানসিক প্রস্তুতির পর্ব অতিক্রান্ত হলে তবে আসে হাতে-কলমে রচনার পর্ব। একবার রচনায় হাত দেওয়ার পর

তখন আর আলস্যের এতটুকু অবকাশ নেই। আবার কেউ আছেন, যাঁর পক্ষে আলস্যকে ভজনা করবার আদৌ প্রয়োজন হয় না, লেখার কথা মনে জাগতে সরাসরি কাগজ-কলম নিয়ে বসেন। এই শ্রেণীর লেখকই হলেন জাত পেশাদার লিখিয়ে। এঁরা কাগজের প্যাড সামনে রেখে কলম নিয়ে বসেছেন কি লেখা কলমের মুখে তরতর করে বেরিয়ে আসতে থাকে। লেখকদের উদ্দেশে একটি পরিচিত নির্দেশ বাণী হচ্ছে, "Dive the pen into the ink and the writing will come of itself" কালিতে কলম ডোবাও, লেখা আপনা থেকেই নির্গত হবে। আজ কাল অবশ্য ঝর্ণা কলমের প্রসাদে কালিতে কলম ডোবাবার আর প্রয়োজন হয় না, তা হলেও এটি একটি খাঁটি লিখনবিধি। শরীর-মনের আড়মোড় ভাঙাতে যত সময় চলে যাবে, ততক্ষণে কোন্-না তোমার দু'পৃষ্ঠা লেখা হয়ে যেতে পারে। লিখতে লিখতেই ভাবের স্ফুরণ হয়, নতুন নতুন আইডিয়া মনকে অধিকার করে। এমনকি, গল্পের প্লটটিও ওই অবস্থায় মনের ভিতর তৈরি হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। সূত্র বা বীজাকারে যে ভাব মনের ভিতর রয়েছে, লিখতে গেলেই দেখা যাবে তা অচিরে ডালপালা মেলে সহস্রশাখা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কলম না হলে কল্পনা ম্রিয়মাণ। কল্পনার তরণীকে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কলমের লগি দিয়ে তাকে ঠেলতে হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসের প্লটই নাকি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়েছে। প্লট আগে ভেবে নিয়ে তারপর তিনি লিখতে বসেন নি। এ পদ্ধতি শরৎচন্দ্রের পদ্ধতির বিপরীত। শরৎচন্দ্র আগে সমস্তটা কাহিনী মনের মধ্যে ছকে তারপর তাকে লিপিবদ্ধ করতেন। গোটা গল্পের চেহারা তাঁর মনে এতই স্পষ্ট ছিল যে, ছায়া-ছবি নির্মাণের ধরনে প্রথম পরিচ্ছেদের পর উনবিংশ পরিচ্ছেদ রচনায় তাঁর অসুবিধা

ছিল না। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র তা-ই করতেন। খতিয়ে দেখলে রবীন্দ্র-অনুসৃত পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত ব্যস্ততাতাড়িত যুগের লেখকদের পক্ষে সমধিক গ্রাহ্য। লিখতে লিখতেই লেখার স্ফূর্তি; লিখতে থাকা কালেই বিষয়বস্তুর উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ, অলঙ্করণ। লেখার আর্ট সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গল্পলেখক সমারসেট ম'মের একটি সুন্দর কথা আছে। তাঁর মতে চিন্তন মনন অনুধ্যান নয়, লিখন ক্রিয়াই লেখকের পক্ষে একমাত্র সত্য জিনিস। শুধু যে লিখতে লিখতে নতুন নতুন আইডিয়া বা ভাব মনকে অধিকার করে তাই নয়, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অকবি কবি হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। লেখবার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মননক্রিয়া আছে। এই কাজে অনেক দিন লেগে থাকলে সংশ্লিষ্ট লেখকের মনের দিগন্ত দিকে দিকে অবারিত হয়ে উঠতে পারে, ওঠেও। রচনার চর্চায় শুধু বুদ্ধি বা হৃদয় বৃত্তিরই চর্চা হয় না, কল্পনাশক্তিরও চর্চা হয়। যে লেখকের কল্পনাশক্তি, সৃষ্টিশক্তি অল্পবিস্তর বন্ধ্যা, একনিবিষ্ট রচনার চর্চার দ্বারা তাঁর সে শক্তির উদ্বোধনের দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে বিরল নয়।

ম'মের এই বিশ্লেষণ আমাদের যথার্থ মনে হয়। প্রতিটি অভিজ্ঞ লেখক স্বকীয় জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। লেখকের পক্ষে আর সব-কিছু গৌণ, লেখনী ধারণকরাটাই আসল। লেখনী লেখকের যুগপৎ হাত এবং হাতিয়ার। পাকা লিখিয়ে কলম হাতে নিয়ে বসে ব্রহ্মাণ্ডকে নতুন করে সৃষ্টি করবার স্পর্ধা রাখেন। স্রষ্টা লেখক স্বভাবে ও ব্যবহারে ভগবানের স্বগোত্র।

শুনতে পাই বার্ণার্ড শ' প্রতিদিন নিয়ম করে পাঁচ পাতা লিখতেন। কোনদিন এ রীতির একচুল এদিক-ওদিক হয় নি। শয়ের সম্পর্কে আরও মজার কথা এই যে পাঁচ পাতার অন্তে বাক্য অসমাপ্ত থাকলে তিনি

বাক্য অসমাপ্তই রাখতেন, তাকে সমাপ্ত করবার জন্যে টেনে ছয়ের পাতায় নিয়ে যেতেন না। অর্থাৎ হিসাব করে পাঁচ পাতার এক লাইন কমও নয় বেশীও নয়। আপাতদৃষ্টিতে শয়ের এই আচরণ অভ্যাসের দাসত্ব মনে হতে পারে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এর দ্বারা তিনি শেষ পর্যন্ত অভ্যাসের দাসত্বকে জয় করেছিলেন। গোড়ায় প্রেরণা তাঁকে ধরা দিতে চায় নি, শেষে নিত্য স্বেচ্ছা-সঙ্গিনী হয়েছিলেন। এই সহচর্যেরই সুফল হল 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান', 'সেণ্ট জোয়ান', 'ডক্টস ডাইলেমা', 'ব্যাক টু মেথুসেলা'র মত সুন্দর শিল্প-কুশল নাটক। অভ্যাসের দ্বারা কী মহৎ কার্য সংসাধিত হতে পারে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ'য়ের দৃষ্টান্ত তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বই ধার দেওয়া

বই ধার চাওয়া ও বই ধার দেওয়া, সম্পর্কে কতগুলি বিচিত্র সংস্কার আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা যখন কাউকে বই ধার দিই বা কারও কাছ থেকে বই ধার আনি, আমরা ধরে নিই সে বই আমার কিম্বা অন্য একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সাময়িকভাবে তা হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র। টাকা ধার দিলে যেমন তা লোকে ফিরে পাওয়ার আশা করে, তেমনি বই ধার দেবার বেলায়ও বইয়ের মালিক শেষ অবধি বইখানি ফিরে পাওয়ার আশা রাখেন। কিন্তু এরূপ আশাবাদিতার সঙ্গত কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। কেননা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব, বই জিনিসটার উপর সত্যি কারও কোন মালিকানাস্বত্ব থাকতে পারে না। ওটি সর্বসাধারণের ভোগ্য বিষয়, সুতরাং স্বতঃই তা সর্বসাধারণের সম্পত্তি। এক হাত থেকে অন্য হাতে তারপর অন্য হাতে - অর্থাৎ হাতে হাতে ঘোরবার জন্যই বইয়ের জন্ম। এমনকি সে বস্তু একেবারে বেহাত হয়ে গেলেও কারও কিছু বলবার থাকতে পারে না। শুনেছি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশায় কাউকে বই ধার দিতেন না; অন্য সব ব্যাপারে তিনি দয়ারসাগর ছিলেন, কিন্তু এই এক ব্যাপারে তিনি দয়াধর্মের অনুরাগী ছিলেন না। তাঁর গৃহের লাইব্রেরী কক্ষের সারি সারি আলমারিতে মরক্কো-চামড়ায় সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্যবান সব বই থরে থরে শোভা পেত, সেখানে তিনি কাউকেই আঁচড় কাটতে দিতেন না। এমনকি অতি-নিকট বন্ধুদের বেলায়ও তিনি এ ব্যাপারে নিতান্ত অকরুণ ছিলেন বলে শোনা যায়।

পরমপূজ্য বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি এটি কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে উচিত কার্য হয়নি। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন, অথচ বই ধার দেবার বেলাতেই ওই সাগর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত এ কেমন কথা। বইয়ের প্রতি এই মমত্ব বোধ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি অতিরিক্ত মমত্ববোধেরই নামান্তর নয় কি? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় দয়াধর্মের চরম পরীক্ষা বই ধার দেওয়ার সামর্থ্যে। যিনি যত অকাতরে ও অবলীলাক্রমে বই ধার দিতে পারেন, তিনি তত দয়ালু ব্যক্তি। কেননা এর দ্বারা আত্মপর ভেদজ্ঞানের বিলোপ বোঝায়, যা দয়াধর্মের প্রধান লক্ষণ। বইয়ের অন্তর্গত জ্ঞান বা রস একার ভোগের জিনিষ নয়। তা সর্বসাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট। আক্ষরিক অর্থে তা হল public property. তা যদি হয়, তাকে ব্যক্তিগত জিম্মায় সব সময় চোখে চোখে আগলে রাখবার কোন অর্থ হয় না। তার উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানারও কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। এক-একখানি বই যত বেশী হাত ঘোরে, যত বেশী মলিন ও জীর্ণ হয়, তত বেশী তার সার্থকতা। কাঁচা বা নিপুণ যে হাতেই লেখা হোক না কেন, বেহাত হওয়া বৈ বইয়ের দাম নেই।

আমার মনে হয় বই ধার নিলে বই যে ফিরিয়ে দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এটি কুসংস্কার বৈ কিছু নয়। বই কি কারও দখলীকৃত সম্পত্তি যে অন্য কেউ তা ভোগদখল করতে চাইলেই তা বেআইনী বলে গণ্য হবে? কথায়ই বলে "ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।" এই প্রচলিত জনশ্রুতিটির সহিত আরও দু'চারটি কথা যোগ করলে মন্দ হয় না। জ্ঞানবানে শুধু বই পড়েই না, পরকীয় বই অম্লান বদনে আত্মসাতও করে। এতে দোষাবহ কিছু নেই, কেননা প্রকৃত জ্ঞানেরই একটি

লক্ষণ এই আত্মপর ভেদজ্ঞানের লোপ। আপনার এবং অপরের পার্থক্যবুদ্ধি যিনি যত অবলীলায় ঘুচিয়ে দিতে পারেন, বুঝতে হবে তাঁর তত বেশী মোহমুক্তি সংসাধিত হয়েছে। পুস্তক হল জ্ঞানের আধার। সুতরাং পুস্তকরূপ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা অজ্ঞান-তিমির দূর করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাস্য-রসিক মার্ক টোয়েনের কথা মনে পড়ল। হাস্য-রসিকেরা সাধারণত জ্ঞানী ব্যক্তি হন। মার্কটোয়েনের দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ, গল্প আছে, একবার মার্ক-টোয়েনের কোন এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁর গৃহে বেড়াতে আসেন। মার্ক-টোয়েন পরম সমাদরে তাঁকে তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে নিয়ে বসান। লাইব্রেরী ঘরটি বইতে ঠাসা, তাকের মাথায় বই, কুলুঙ্গিতে বই, টেবিলে বই—সর্বত্র বইয়ের ছড়াছড়ি। বইগুলি সবই খুব সুদৃশ্য ও মূল্যবান, কিন্তু যে সব আলমাবি বা র‍্যাকে তাদেব বাখা হয়েছে তাদের চেহারা নিতান্ত জীর্ণ। আধার এবং আধেযের এই অসঙ্গতি স্বভাবতঃই বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি মার্ক-টোয়েনকে এ বিষয়ে কিছু বলতে মার্ক-টোয়েন আসল রহস্য ফাঁস করলেন। বললেন, বই-গুলি যেভাবে হাত কবা হয়েছে, আলমারীগুলি নানা কারণেই সেভাবে হাত করা সম্ভব হয় নি, তাইতেই পুস্তক এবং পুস্তকাধারের এই বৈসাদৃশ্য। অর্থাৎ বইগুলি পরস্মৈপদী, সাজ-সরঞ্জামগুলি মাত্র সদাশয মার্ক-টোযেনের নিজের পয়সায় কেনা। এরূপ অবস্থায় আধার এবং আধেয়েব বৈসাদৃশ্য না ঘটে পারে না।

হাস্যরসিকের আবরণে টোযেন ছিলেন পরম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাই তাঁর এই সর্ববস্তুতে সমদর্শিতা। আত্মপর ভেদবুদ্ধি লুপ্ত না হলে এই সমদর্শিতা জন্মায না। মার্ক টোয়েন পুস্তকগুলিকে যেভাবে হস্তগত করেছিলেন, সম্ভব হলে পুস্তক-রক্ষণীগুলিকেও বোধ হয় তদ্রূপ

কায়দায় হস্তগত করতেন। কিন্তু সেটা নিতান্ত পুকুর চুরির সামিল হত, অতটা বোধ হয় জ্ঞানীরও ধাতে কুলায় না। তাই একটা সীমায় এসে তাঁর পরস্মৈপদী চর্চা থেমে গিয়েছিল, তার বেশী তিনিও অগ্রসর হতে পারেন নি।

বই ধার দেওয়া ধার নেওয়ার ব্যাপারে আমি উত্তমর্ণের দলে। বন্ধুদের আমি এন্তার বই ধার দিয়ে থাকি। বন্ধুদেরও আমার এই বদান্যতার সুযোগ গ্রহণে কোনরূপ কার্পণ্য দেখি না। যখন-তখন তাঁরা আমার লাইব্রেরী কক্ষে হামলা করেন এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই বই বগলদাবা করে প্রস্থান করেন। বন্ধুদের এই একান্ত-আত্মীয়তার অভিব্যক্তিতে আমি ক্ষুণ্ণ হই না, বরং মনে মনে খুশি হই এই ভেবে যে, আমার সঙ্গে আমার বন্ধুদের পার্থক্য চেতনা কতই না ক্ষীণ, কতই না অকিঞ্চিৎকর! বন্ধুরা আমার এই মনোভাব অবগত আছেন এবং তাঁরা তার মর্যাদাও দিতে জানেন। আমার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ তাঁরা যে বই একবার নেন সে বই আর ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে অপমানিত করেন না। যত আগ্রহভরে আমি তাঁদের বই পড়তে দিই ততদূর ঔদাসীন্যবশে সেই বই ফিরিয়ে না দিয়ে তাঁরা আমাকে বাধিত করেন। বই ফিরিয়ে দিতে তাঁরা যত বেশী বিস্মৃত হন, আমার প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক ভালবাসার প্রমাণ পেয়ে তত আমি ধন্য হই। আমারও কথা হল এই, বই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে তাকে অষ্টক্ষণ স্বার্থ-বুদ্ধির বেড়া দিয়ে আগলে রাখতে হবে। আমি যে আমার ঘরে তাকের পর তাক বই বোঝাই করে রেখেছি, সে শুধু বন্ধুজনদের পাঠ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার জন্যে। যে বই আমি শুধু নিজে পড়বার সুযোগ পাই, আমার বন্ধুরা পড়েন না, প্রতিবেশীরা পড়েন না, সে বইয়ের মূল্য অনেকখানি পরিমাণে খণ্ডিত। পৃথিবীর আলো-বাতাসে

যেমন সকলের সমান অধিকার, তেমনি মুদ্রিত অক্ষরের উপরও সকলের তদ্রূপ অধিকার। আমার টাকায় বই কেনা হয়েছে বলে সে বই শুধু আমিই পড়ব আর কেউ তা পড়তে পাবে না—এরূপ নীরন্ধ্র আত্ম-কেন্দ্রিকতার আমি সমর্থক নই। যে বইয়ের অক্ষরমালার উপর দুটি চক্ষুর দৃষ্টিমাত্র আপতিত হয়েছে, বহু চক্ষুর জ্যোতি বিকীর্ণ হয় নি, সে বই আংশিক অফলা হয়েই রইল।

বইয়ের সম্পর্কে কত গল্পই মনে পড়ছে, একটি মাত্র গল্পের উল্লেখ করে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করব। গল্পটি বই ধার দেওয়া নিয়ে নয়, বই উপহার দেওয়া নিয়ে। খতিয়ে দেখতে গেলে বই উপহার দেওয়া আর বই ধারদেওয়া একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। বই উপহার-দেওয়ার যা ফল, বই ধার দেওয়ারও ঠিক সেই ফল। তবু বরং বই উপহার দিলে সে বই দাতার হাতে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে (নীচের গল্পটি তার প্রমাণ), কিন্তু ধারদেওয়া বইয়ের বেলায় সে সম্ভাবনা বোধ হয় একেবারেই শূন্য।

একবার বার্নার্ড শ তাঁর এক বন্ধুকে স্বরচিত একটি বই উপহার দেন। তাতে লিখে দেন—"With best wishes—Bernard Shaw"। কিছুদিন বাদে একটি পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে (শ'য়ের পুরনো বই কেনার বাতিক ছিল) শ' সেই বইটিকে গাদার মধ্যে আবিস্কার করেন। বইটি তিনি কিনে নেন। তারপর সে বই পুনরায় তিনি তাঁর বন্ধুকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। তাতে লেখা ছিল—"With repeated best wishes—Bernard Shaw."

মননশীল প্রবন্ধকার হিসেবে শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরীর খ্যাতি অনস্বীকার্য। সাহিত্য, সমাজ-নীতি, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং তাঁর চিন্তার ফসল তিনি বিতরণ করেছেন সাহিত্যরসিক পাঠক-সমাজকে। সাহিত্যে, সমাজে যেখানেই তিনি অসঙ্গতি দেখেছেন, সেখানেই তাঁর সুমার্জিত আঘাতের বাণ নিক্ষেপ করেছেন তিনি; আর, তাঁর কথা বলার ভঙ্গি সর্বদাই সুললিত। 'অম্ল-মধুর' কতকগুলো আশ্চর্য মধুর প্রবন্ধের সমষ্টি।